POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর, রাত্রি (আগমণ) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।

(আল বাকারা: ১৮৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 18

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 5 মে, 2022 3 শওয়াল 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আযানের কাছাকাছি সময় সেহরি খাওয়া।

১৯২০) হযরত সাহাল বিন সাআদ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি পরিবারের সঙ্গে যখন সেহরি খেতাম, তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে সকালের নামায পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করতাম।

ভুল করে খেলে রোযা পূর্ণ করা উচিত।

১৯৩৩) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন- কেউ যদি ভুল করে খেয়ে নেয় বা পান করে নেয়, তবে তার উচিত রোযা পূর্ণ করা। কেননা আল্লাহ্ তা'লাই খাইয়েছেন এব পান করিয়েছেন।

সফরে রোযা রেখে কোনও পুণ্য অর্জন হয় না।

১৯৪৬) হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) একটি সফরে ছিলেন, তিনি কিছু মানুষের ভিড় দেখলেন আর তার মধ্যে এক ব্যক্তিকে লোকে ছায়া করে রেখেছিল। তিনি (সা.) বললেন- এটি কি? লোকেরা উত্তর দিল- সে রোযা রেখেছে। তিনি (সা.) বললেন- সফরের রোযার কোনও পুণ্য লাভ হয় না।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুস সাউম, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

জুমআর খুতবা, ১ এপ্রিল, ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব
হুযুরের সফর বৃত্তান্ত

মানুষের জন্য নিজের উপর দয়া না করা কর্তব্য। বরং নিজেকে তার এমন ভাবে তৈরী করা উচিত যেন খোদা তা'লা তার উপর কৃপা করেন। কেননা মানুষের দয়া তার জন্য জাহান্নাম। আর খোদা তা'লার দয়া জান্নাত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

এটি একটি সূক্ষ্ম বিষয়। যদি কোনও ব্যক্তির (নিজের অলসতার কারণে) নিকট রোযা কষ্টকর হয় আর নিজের মনে ধারণা করে যে সে অসুস্থ, তার শরীরের অবস্থা এমন যে না খেলে অমুক অমুক রোগ দেখা দিবে- তাহলে এমন ব্যক্তি যে খোদা তা'লার নেয়ামতকে নিজের জন্য কষ্টকর মনে করে, কিভাবে এই পুণ্যের অধিকারী হবে? কিন্তু যে ব্যক্তির হৃদয় একথা ভেবে আনন্দিত হয় যে রমযান এসেছে আর সে এর জন্য অপেক্ষায় ছিল,রমযান এলে রোযা রাখবে। এরপর অসুস্থতার কারণে রোযা রাখতে পারল না তবে সে উর্ধ্বলোকে রোযা থেকে বঞ্চিত হয় না। এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ বাহানা খোঁজে আর মনে করে যে, যেভাবে তারা মানুষকে ধোকা দেয়, অনুরূপভাবে খোদাকে ধোকা দিবে। বাহানা সন্ধানী নিজের মধ্যেই সুযোগ খুঁজে আর কৃত্রিমতা যোগ করে সেই বিষয়গুলিকে সঠিক বলে মনে করে। কিন্তু খোদা তা'লার নিকট তা সঠিক নয়। কৃত্রিমতার অধ্যায় অত্যন্ত বিশাল। মানুষ চাইলে এই (কৃত্রিমতা) দৃষ্টিকোণ থেকে আজীবন বসে নামায পড়তে পারে আর রমযানের রোযা একেবারে রাখবে না। কিন্তু খোদা সত ও নিষ্ঠাবানের ইচ্ছা ও সংকল্পকে জানেন । খোদা তা'লা জানেন যে তার হৃদয়ে বেদনা রয়েছে আর খোদা তা'লা তাকে প্রতিদানের থেকে বেশি দিয়ে থাকেন। কেননা অন্তরের বেদনা একটি মূল্যবান বিষয়। বাহানা সন্ধানী মানুষ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে কিন্তু খোদা তা'লার নিকট এই নির্ভরতা কোনও মূল্য রাখে না। আমি যখন ছয় মাস রোযা রেখেছিলাম, তখন একবার আম্বিয়াদের একটি দল আমার (দিব্যদর্শনে) সঙ্গে সাক্ষাত করে। তারা আমাকে বললেন, তুমি কেন নিজেকে এত কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখেছ। এর থেকে বেরিয়ে এস। অনুরূপভাবে মানুষ যখন নিজেকে খোদার জন্য কষ্টে ফেলে তখন তিনি স্বয়ং মাতাপিতার ন্যায় দয়া করে তাকে বলেন যে কেন এত কষ্টে পড়ে রয়েছ?

খোদা তা'লার দয়া।

এরা কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে কষ্ট থেকে বঞ্চিত রাখে। এই কারণে খোদা তা'লা তাদেরকে অন্যান্য কষ্টে নিপতিত করেন, সেই কষ্ট থেকে বের করেন না। আর অন্যরা যারা নিজে কষ্টের মধ্যে পড়ে তিনি তাদেরকে নিজে বের করেন। মানুষের জন্য নিজের উপর দয়া না করা কর্তব্য। বরং নিজেকে তার এমন ভাবে তৈরী করা উচিত যেন খোদা তা'লা তার উপর কৃপা করেন। কেননা মানুষের দয়া তার জন্য জাহান্নাম। আর খোদা তা'লার দয়া জান্নাত। ইব্রাহিমের কাহিনী প্রণিধান করে দেখ, যে আগুনে ঝাঁপ দিতে চায় খোদা তা'লা তাকে আগুন থেকে রক্ষা করেন। আর যে নিজে আগুন থেকে রক্ষা পেতে চায় সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৬৪)

রোযার কল্যাণে তাদের উপর সত্য স্বপ্ন কা দিব্যদর্শনের দ্বার খুলে দেন। এবং তাদেরকে অদৃশ্যে গোপন রহস্যাবলী সম্পর্কে সংবাদ দেন।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

রোযার আধ্যাত্মিক উপকারও রয়েছে। এর পরিণামে আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম মানুষের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। আর তার দিব্য দৃষ্টিতে বেশি জ্যোতি ও নুর সৃষ্টি হয়। বস্তুত ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে, আল্লাহ্ তা'লার কোনও অভ্যাস নেই, কিন্তু তাঁর মধ্যে অভ্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্য অবশ্যই পাওয়া যায়। মানুষের মত তাঁর চোখ নেই, কিন্তু তিনি সর্বদ্রষ্টা। তাঁর কান নেই, কিন্তু তিনি সর্বশ্রোতা। অনুরূপভাবে তাঁর মধ্যে কোনও অভ্যাস নেই, কিন্তু যখন তিনি কোনও কাজ করেন তখন তার পুনরাবৃত্তি করেন। মানুষের মধ্যেও এই অভ্যাসটি রয়েছে। অনেকের হাত পা নাড়ার অভ্যাস থাকে। বার বার হাত পা নাড়তে থাকে। আর অভ্যাসের অর্থ কোন কাজ বার বার করা আর এটা আল্লাহ্ তা'লার মধ্যেও রয়েছে। যখন তিনি কোনও বিশেষ সময়ে স্বীয় কৃপা নাযেল করেন,তখন তিনি তা বার বার নাযেল করেন। আল্লাহ্ তা'লার এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে, যেহেতু রমযান মাসে কুরআন নাযেল হয়েছিল,তাই যদি রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর অনুসরণ করা যায়, যাঁর উপর কুরআন নাযেল হয়েছিল,তবে আল্লাহ্ তা'লার অভ্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে এমন গুণাবলীর অধীনে রসুলের অনুসরণ করার কারণে সেই সব মানুষ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর পৃথিবীতে থেকেও এর থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করে দেয়। খাওয়া, ঘুম ইত্যাদি কম করে দেয় আর অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। তাদের উপর তখন আল্লাহ্ তা'লা ইলহাম নাযেল

শেষাংশ ৮ পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

তাহরীকে জাদীদ ও রমযানের সম্পর্ক

তাহরীকে জাদীদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বরকতমন্ডিত রমযান মাসের সঙ্গে তাহরীকে জাদীদের গভীর সম্পর্কের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন,

" যদি তোমরা রমযান থেকে লাভবান হতে চাও তবে তাহরীকে জাদীদকে মেনে চল, আর যদি তাহরীদের উপকার করতে চাও তবে সঠিকভাবে রমযান থেকে উপকৃত হও। সাধারণভাবে জীবনযাপন করা, পরিশ্রম ও কষ্ট করা এবং নিজেকে ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত করে তোলাই হল তাহরীকে জাদীদ। রমযান তোমাদেরকে এই শিক্ষা দিতেই এসে থাকে। অতএব যে উদ্দেশ্যে রমযান এসেছে তা অর্জন করার জন্য সংগ্রাম রত থাক। প্রত্যেক ব্যক্তি চেষ্টা করা উচিত, তার রমযান যেন তাহরীক জাদীদ সম্বলিত হয় এবং এবং তাহরীক জাদীদ যেন রমযান সম্বলিত হয়। রমযান যেন আমাদের আমিত্বকে ধ্বংস করে এবং এবং তাহরীক জাদীদ আমাদের আত্মাকে সঞ্জীবিত করে। তাই আমি যখন বলি যে, রমযান থেকে লাভবান হও, তখন এর অর্থ ছিল যে, তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যাবলীকে তোমরা রমযানের আলোকে বোঝ। আর যখন আমি বললাম যে, তাহরীকে জাদীদের প্রতি দৃষ্টি দাও তখন ভিন্ন বাক্যে এর অর্থ হল, তোমরা প্রত্যেক অবস্থায় নিজেদের উপর রমযানে অবস্থা সৃষ্টি করে রাখ এবং নিজেদেরকে প্রকৃত ও নিরবিচ্ছিন্ন ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত করে তোল। যে রমযান প্রকৃত ত্যাগ ছাড়াই অতিক্রান্ত হয়ে যায় সেটি রমযান নয় এবং যে তাহরীকে জাদীদ আত্মার সতেজতা ছাড়া অবিাহিত হয় সেটি তাহরীক জাদীদ নয়। "

(খুতবা জুমা, ৪ নভেম্বর, ১৯৩৮)

এই প্রসঙ্গেই ১১ই নভেম্বর, ১৯৩৮ সালের খুতবা জুমায়র শেষে হুযুর (রা.) জামাতকে তাহরীক জাদীদের জন্য চাঁদাদানকারীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করে তিনি (রা.) বলেন,

" রমযানের আগামী শেষ দশ দিনকে তাহরীকে জাদীদ বিষয়ক পূর্বের কুরবানী সমূহের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যায় কর। যারা বিগত বছরগুলিতে কুরবানী করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তারা এর জন্য আল্লাহ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করুন এবং প্রত্যেক দোয়াকারী প্রতেক কুরবানীকারীর জন্য দোয়া করুন যে, ধর্মের গৌরব ও মর্যাদা এবং দৃঢ়তার জন্য সে যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তার প্রতিদানে আল্লাহ তা'লা তার উপর কৃপা ও রহমত বর্ষন করুন। এবং যে ভালবাসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সে খোদার পথে কুরবানী করেছিল সেই অনুযায়ী তার প্রতি ভালবাসা ও কল্যাণ নাযেল করুন। আমীন॥"

(আল ফযল, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩৮, পৃষ্ঠা-৪)

দৈনিক আল ফযল কাদিয়ান ২৯ শে নভেম্বর, ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত ঘোষণা অনুযায়ী জামাতের একনিষ্ঠ সদস্যগণের প্রথম থেকেই রীতি হল, তারা সব সময় রমযান মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অঙ্গিকারকৃত তাহরীকে জাদীদের চাঁদা একশত ভাগ পরিশোধ করে আল্লাহ তা'লার কৃপারাজি ও বরকত অর্জন করার চেষ্টা করেন। অতএব, আমরা যেহেতু আল্লাহ তা'লার কৃপায় আরও একবার অশেষ ঐশী রহমত ও বরকতের ধারক এই পবিত্র রমযান মাসে প্রবেশ করতে চলেছি, তাই তাহরীকে জাদীদের প্রত্যেক সাহায্যকারীর নিকট আবেদন এই যে, জামাতের এই অনন্য রীতি বজায় রেখে ২০ শে রমযান তারিখ পর্যন্ত নিজেদের চাঁদা সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধ করে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়া থেকে অধিক অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সকলকে অনেক অনেক তৌফিক দান করুন। আমীন॥

সমস্ত জেলা ও স্থানীয় স্তরীয় আমীরগণ, সদর, সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবগণের নিকট আবেদন করা হচ্ছে যে, অনুগ্রহপূর্বক নিজের নিজের জামাতের একশত ভাগ চাঁদা দানকারীগণের তালিকা ডাকযোগে এবং ই-মেল যোগে ওকালত তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ানে প্রেরণ করুন। যাতে সমস্ত জামাতের সম্মিলিত তালিকা ২৯ শে রমযানের ইজতেমায়ী দোয়ায় হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে পেশ করা যায়। জাযাকুমুল্লাহ॥

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) বলেন,

"মাহে রমযান পাঁচটি ইবাদতের সমষ্টি। প্রথমটি হল রোযা রাখ, দ্বিতীয়টি ফরয নামায ছাড়াও রাত্রি জাগরণ অর্থাৎ রাতে নফল ইবাদতসমূহ (তারাবীহ, তাহাজ্জুদের নামায ইত্যাদি) আদায় করা এবং বিনয়ের সাথে নিজ প্রভুর কাছে সব ধরণের মঙ্গল কামনা করা। তৃতীয়টি বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা। চতুর্থটি দান-খয়রাত করা এবং পঞ্চমটি প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা হতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা।"

ওয়াকফে জাদীদ ও রমযান

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) ১৯৯৮ সালে ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন,

" এখন রমযান মাস চলছে, আর এই বিষয়টিকে রমযানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চাই যা প্রকৃতপক্ষে ওয়াকফে জাদীদের জন্যই আরম্ভ করা হয়েছিল। আর সেটি হল, রমযানের বরকতে ওয়াকফে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের বরকতে রমযান যেন অংশীদার হয়। আল্লাহ তা'লার রাস্তায় ব্যায়কারীদের জন্য সুসংবাদ দিয়ে তিনি বলেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, ' প্রত্যেক প্রভাতে দুই জন ফিরিস্তা নেমে আসেন। তাদের মধ্যে একজন বলেন, হে আল্লাহ ব্যায়কারী অকৃপণকে আরও বেশি করে দাও এবং তার পদাঙ্ক অনুসারীর দল সৃষ্টি কর। দ্বিতীয় ফিরিস্তা বলেন, হে আল্লাহ! মজুতকারী কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস কর এবং তার সম্পদকে ধ্বংস করে দাও।' এর মধ্যে থেকে প্রথম অংশটি তো স্পষ্ট। আল্লাহ তা'লার পথে ব্যায়কারীদের জন্য ফিরিস্তারা দোয়া করে থাকেন এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের জন্যও দোয়া করেন বিশেষ করে যারা রমযান মাসে খরচ করে। অতএব আপনারা নিজেদের পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে অল্পবয়স্কদেরকেও সাথে নিন, নিজেদের প্রতিবেশী ও পরিচিতদেরকেও সাথে নিন যাতে পুণ্যের বিষয়টি ব্যাপকতা লাভ করে এবং জগতজুড়ে ব্যাপৃত হয়। এটি একটি এমন কর্ম যা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে সূচিত ধারার অনুকুলে প্রবাহিত হবে। ফিরিস্তারা দোয়া করবেন এবং আপনারা যখন পুণ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকবেন তখন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আল্লাহ তা'লা তাঁর পথে ব্যায়কারীদের সম্পদে আরও বরকত দিবেন। এই বরকতের দৃষ্টান্ত আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছি। গোটা পৃথিবীতে এমন ব্যায়কারীদেরকে আল্লাহ তা'লা আরও বেশি সমৃদ্ধ করছেন এবং তাদের মতই আরও অনেককে সৃষ্টি করছেন, যার ফলে আহমদীয়াতের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার অতি সহজেই নির্বাহ হচ্ছে।

(খুতবা জুমা, ২রা জানুয়ারী, ১৯৮৮, মসজিদ ফযল লন্ডন)

ইনশাল্লাহ পূর্বের ন্যায় এবছরও রমযান মাসের শেষে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পূর্ণরূপে পরিশোধকারীে ব্যক্তিদের নাম সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে পেশ করা হবে। অতএব ওয়াকফে জাদীদের সমস্ত সংগ্রামীদের নিকট আবেদন যে, তারা যেন রমযান মাসে চাঁদা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়ার অংশীদার হয়। এবং জামাতের সমস্ত পদাধিকারীগণ , মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমগণের নিকট আবেদন করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই মাসে ওয়াকফে জাদীদের সমস্ত চাঁদা পরিশোধকারীদের নামের তালিকা ফর্মে পূর্ণ করে ২৫ শে রমযানুল মুবারক পর্যন্ত এই দফতরে প্রেরণ করেন। জাযাকুমুল্লাহ॥

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের চাঁদার দিকে লক্ষ্য রেখে নিজেদের দায়িত্ব পালনপূর্বক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রত্যাশার উর্দ্ধে প্রবৃদ্ধিসহকারে ওয়াকফে জাদীদের লক্ষ্যমাত্রা যথাশীঘ্র পুরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন॥

সদকাতুল ফিতর আদায়

আলহামদোলিল্লাহ এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়েছে। ইসলামে ফিতরানা আদায়ের জন্য এক 'সা' (যা প্রায় ২ কিলো ৭৫০ গ্রাম) -এর হার নির্ধারিত রয়েছে। জামাতের সদস্যদের উচিত সঠিকহারে রমযানের প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে সদকাতুল ফিতর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। যেহেতু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ফসলের (চাউল, গম)-এর মূল্য ভিন্ন। এই কারণে নিজেদের স্থানীয় মূল্যে নির্ধারিত হার (২ কিলো ৭৫০ গ্রাম ফসল) অনুসারে ফিতরানার চাঁদা দান করুন।

এবছর সাদকাতুল ফিতর মাথাপিছু ৭০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। স্থানীয় জামাতে অভাব-পীড়িত ও সদকা পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ থাকলে সদকাতুল ফিতরের মোট অর্থের নব্বই শতাংশ পর্যন্ত মজলিসে আমেলার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতরণ করা যেতে পারে। অবশিষ্ট অর্থ মরকযে জমা করে দিতে হবে। জামাতে যদি দরিদ্র ও সদকা পাওয়ার মত ব্যক্তি না থাকে তবে সেই জামাতে সংগৃহীত অর্থের সম্পূর্ণটাই সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার জামাতী খাতায় জমা করে দিতে হবে।

স্পষ্ট থাকে যে, ফিতরানার অর্থ মসজিদ বা অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করার অনুমতি নেই।

(নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান)

জুমআর খুতবা

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর মৃত্যুর পর আমরা এমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলাম যে, যদি আল্লাহ্ আমাদের উপর আবু বাকারের দ্বারা অনুগ্রহ না করতেন তবে খুব সম্ভব ছিল আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। অতএব স্মরণ রেখ! আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যখন সাহায্য আসে তখন কেউ তা প্রতিহত করতে পারে না।

মহানবী (সা.) -এর মৃত্যুর পর যখন প্রায় পুরো আরব মুরতাদ হয়ে যায় আর অনেকে প্রকাশ্যে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় আর অনেকে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। পরিতাপের বিষয় হল, আজও বিশ্ববাসী এ বিষয়টি বুঝে নি, বরং মুসলমানরা নিজেরাও মুরতাদদের হত্যা করাকে বৈধ মনে করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অথচ কারো বিশ্বাস সত্য হোক বা মিথ্যা তাকে সবসময় তেমনই সত্য মনে করা হয় যেভাবে একজন মুসলমান তার ধর্মকে সত্য মনে করে।

যদি কেউ মুরতাদ হয়ে আবার ঈমান আনে অতঃপর পুনরায় মুরতাদ হয়ে আবার ঈমান আনে সেক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তা'লার হাতে। যদি কাফির অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে নিশ্চিত জাহান্নামী হবে। যদি মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হত তাহলে তার বারংবার ঈমান আনা এবং অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই আসত না।

কুরআনের আয়াত, হাদীস এবং ইসলামের ইতিহাসের আলোকে ইসলামে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কি না তার উপর বিস্তারিত আলোচনা।

মাননী মহম্মদ বশীর শাদ সাহেব (সাবেক মুবাল্লিগ, যুক্তরাষ্ট্র), মহম্মদ সিদ্দীক রানা সাহেব (সিয়ালকোট) এবং মহম্মদ আহমদ খাজা সাহেবের মৃত্যু সংবাদ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ১ মে, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (১ শাহাদাত, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগের অশান্তকর পরিস্থিতি ও নৈরাজ্য সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এ বিষয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক 'সিররুল খিলাফা'তে বর্ণনা করেন, ইবনে খুলদুন লিখেছেন যে, সমস্ত আরবের সাধারণ মানুষ ও বিশেষ শ্রেণীর লোক মুরতাদ হয়ে যায়। বনু ত্যায় এবং বনু আসাদ 'তুলায়হার' হাতে ঐক্যবদ্ধ হয়। এছাড়া বনু গাতফান মুরতাদ হয়ে যায়। বনু হাওয়াযেন দ্বিধান্বিত ছিল এবং তারা যাকাত দেয়া বন্ধ করে দেয়। এছাড়াও বনু সোলায়েমের গোত্রপতি মুরতাদ হয়ে যায়। একইভাবে অন্যান্য স্থানের লোকদের অবস্থাও প্রায় একই ছিল।ইবনে আসির নিজ ইতিহাসে লেখেন, আরবরা মুরতাদ হয়ে গেছে, প্রত্যেক গোত্রের মাঝ থেকে সাধারণ-অসাধারণ সকলের কপটতা প্রকাশ পেয়ে যায় আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা মাথাচাড়া দিতে থাকে। এছাড়া মুসলমানদের আপন নবী (সা.)-এর মৃত্যু আর নিজেদের সংখ্যাস্বল্পতা এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্যের কারণে অবস্থা এমন (সংকটাপন্ন) হয়েছিল যেভাবে বৃষ্টি ভেজা রাতে ছাগলভেড়ার হয়ে থাকে (অর্থাৎ ভয়ে জড়সড় হয়ে যায় এবং আশ্রয়স্থল খোঁজে)। তখন লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে, লোকেরা কেবল উসামার সৈন্যবাহিনীকেই মুসলমানদের সৈন্যসামন্ত মনে করে আর আপনি যেরূপ দেখছেন, আরবরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাই মুসলমানদের এই দলকে আপনার থেকে পৃথক করা সমীচীন হবে না। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! হিংস্র প্রাণী যদি আমাকে ছিড়ে খাবে বলে আমি নিশ্চিতও জানি তবুও অবশ্যই মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী আমি উসামার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করব। মহানবী (সা.) যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন আমি তা রহিত করতে পারি না।হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রা.)-এর বরাতে বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আমরা এমন এক স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম যে, হযরত আবু বকরের মাধ্যমে আল্লাহ্ যদি আমাদের প্রতি কৃপা না করতেন তাহলে আমরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে এ কথার ওপর ঐক্যবদ্ধ করেন যে, আমরা 'বিনতে মাখায' তথা এক বছর বয়সী উটনী এবং এবং 'বিনতে লগূন' তথা দুই বছর বয়সী উটনীর যাকাতের জন্য যুদ্ধ করব এবং আমরা আরবকে পদানত করবো আর আমৃত্যু আমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে থাকব।

(সিররুল খিলাফাহ, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ১৮৮,১৮৯)

এই যে বিতর্ক চলছে, এর কারণে কতিপয় ভুল-বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে আর এ প্রশ্নও উত্থাপিত হতে পারে যে, ইসলামে কি মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড? এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি।

মহানবী (সা.) -এর মৃত্যুর পর যখন প্রায় পুরো আরব মুরতাদ হয়ে যায় আর অনেকে প্রকাশ্যে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় আর অনেকে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাদের সবার বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে এমন লোকদের জন্য মুরতাদ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে পরবর্তী জীবনীকার এবং আলেমরা ভুল করেন বা তারা এ ভুল শিক্ষা প্রচারের কারণ হয়েছেন যে, মুরতাদের (ধর্মত্যাগীর) শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড আর এজন্যই হযরত আবু বকর সকল মুরতাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন এবং যারা পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে নি এমন সকল লোককে তিনি হত্যা করিয়েছেন। এভাবে সেসব ঐতিহাসিক ও জীবনীকারকগণ হযরত আবু বকরকে খতমে নবুয়্যত সংক্রান্ত বিশ্বাসের সংরক্ষণকারী ও এর নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। অথচ বাস্তবতা হল, খিলাফতে রাশেদার ঐ যুগে খতমে নবুয়্যত ও খতমে নবুয়্যত সংক্রান্ত বিশ্বাসের এরূপ সংরক্ষণের কোন ধারণা বা মতবাদের অস্তিত্বই ছিল না, আর খতমে নবুয়্যত সংকটাপন্ন ছিল বলে সেসব লোকের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করা হয়েছে- বিষয়টি এমন নয়; কিংবা যেহেতু মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড- তাই তাদেরকে হত্যা করা হোক। এটি বিস্তারিত বর্ণনা তো পরে করা হবে; তাদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করা হল- সেই বিষয়ে বর্ণনা করা হবে। প্রথমে এটি বলা আবশ্যক, কুরআন শরীফ বা মহানবী (সা.) কি মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন, নাকি অন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন?

ইসলামের পরিভাষায় মুরতাদ সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দেয় এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। কুরআন শরীফের দিকে তাকালে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন স্থানে মুরতাদদের উল্লেখ করলেও তাদেরকে হত্যা করার বা কোন ধরনের জাগতিক শাস্তির উল্লেখ করেন নি। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করা হচ্ছে। প্রথম আয়াতটি হল:? ??

অর্থাৎ 'আর তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই নিজ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় ও কাফের অবস্থায় মারা যায়, সেক্ষেত্রে এরাই এমন লোক যাদের কর্ম ইহকালেও এবং পরকালেও ব্যর্থ হয়েছে; এবং এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা দীর্ঘকাল বসবাস করবে।' (সূরা আল্ বাকারা: ২১৮)

এই আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে-ই মুরতাদ হয়ে যায় এবং অবশেষে এই অবিশ্বাসের মাঝেই মারা যায়এই কথাটি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছিল না। কেননা যদি তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতো তবে একথা বলা হতো না- এমন মুরতাদ অবশেষে অস্বীকারী হিসেবে মারা যায়। এরপর আরেক স্থানে বলেন:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ 'হে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের পরিবর্তে এমন এক জাতি নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও তারা তাঁকে ভালবাসবে; মু'মিনদের প্রতি তারা অত্যন্ত সদয় হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর ভর্ৎসনাকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহ্র কৃপা, তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী ও চিরস্থায়ী জ্ঞানের অধিকারী।'
(সূরা আল্ মায়েদা: ৫৫)

এই স্থানেও মুরতাদদের উল্লেখ করে মু'মিনদেরকে এই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, এমন লোকদের পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লা জাতির পর জাতি দান করবেন, কিন্তু কোথাও একথা উল্লেখ করেন নি যে, মুরতাদদের হত্যা করো বা অমুক অমুক শাস্তি দাও।এরপর আরও একটি আয়াত রয়েছে যা সব ধরনের সন্দেহ ও প্রশ্নের নিরসন ঘটায়, আর তা হল সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

অর্থাৎ 'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে অতঃপর অস্বীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে অতঃপর অস্বীকার করে আর অস্বীকারে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে, তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, আল্লাহ্ এমন নয়।' (সূরা আন্ নিসা: ১৩৮)

অতএব একথাটি এখানে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড আর আমাদের সাহিত্যেও এই ব্যাখ্যাই করা হয়। তফসীরকারকরাও এর ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) নিজ অনূদিত কুরআনে এর কিছুটা বিবরণ এভাবে তুলে ধরেছেন যে, এই আয়াত এ বিশ্বাসের খণ্ডন করে যে, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অতঃপর তিনি বলেন, যদি কেউ মুরতাদ হয়ে আবার ঈমান আনে অতঃপর পুনরায় মুরতাদ হয়ে আবার ঈমান আনে সেক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তা'লার হাতে। যদি কাফির অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে নিশ্চিত জাহান্নামী হবে। যদি মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হত তাহলে তার বারংবার ঈমান আনা এবং অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই আসত না।?

(কুরআন করীম উর্দু অনুবাদ, হযরত মির্যা তাহের আহমদ রাহেমাহুল্লাহু তা'লা, পৃ: ১৫৮-এর টিকা)

এছাড়াও কুরআনে আরও কিছু আয়াত রয়েছে যা নীতিগতভাবে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড-মর্মে ধারণার খণ্ডন করে। যেরূপ আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۖ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

অর্থাৎ 'এবং তুমি বল, 'সত্য সেটিই যা তোমার প্রভুর পক্ষ হতে প্রেরিত। সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক'। আমরা নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য এমন আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি যার প্রাচীর তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেরবে। এবং যদি তারা পানি চায় তাহলে তাদেরকে এমন পানি দেওয়া হবে যা হবে গলিত তামার, যা তাদের মুখমণ্ডলকে ঝলসে দিবে। তা অত্যন্ত মন্দ পানীয় এবং অতি মন্দ বিশ্রামস্থল।'
(সূরা আল্ কাহাফ: ৩০)

ধর্ম সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগের ধারণার খণ্ডন করে বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ 'ধর্মের বিষয়ে কোন বলপ্রয়োগ নাই। নিশ্চয় সৎপথ ও ভ্রষ্টতা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং যে ব্যাক্তি কোন শয়তানকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনে নিশ্চয় সে এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মজবুত করে ধরেছে যা কখনও ভাঙবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।' (সূরা আল্ বাকারা: ২৫৭)

কুরআন করীমের কিছু আয়াত দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে ধর্মের নামে সর্বপ্রকার কঠোরতা, বলপ্রয়োগ এবং শাস্তিপ্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর মুরতাদদের উল্লেখ করে কোন ধরনের শাস্তির উল্লেখ না করা আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে; অর্থাৎ মুরতাদের জন্য ইসলাম ধর্ম কোন প্রকার শারীরিক ও জাগতিক শাস্তি নির্ধারণ করে না।

কুরআনের এই শিক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন বিশেষভাবে এ থেকেও হয় যে, কুরআন করীমের অনেক স্থানে মুনাফেকদের উল্লেখ রয়েছে আর মুনাফেকদের অপকর্মের কথা এত ফলাও করে উল্লেখ করা হয়েছে যেভাবে কাফেরদের অপকর্মের উল্লেখ করা হয় নি। তাদেরকে দুষ্কৃতকারীও আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কাফেরও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাদের সম্পর্কে ইসলাম গ্রহণের পর অস্বীকার করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এমন কোন মুনাফেকের জন্য কোন শাস্তির কথা উল্লেখ নাই। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে, কোন মুনাফেককে তার কপটতার কারণে শাস্তি দেওয়া হয় নি। যেমন, মুনাফেকদের উল্লেখ করতে গিয়ে কুরআন বলে,

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ○ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ○ (التوبة:53-54)

অর্থাৎ 'তুমি বলে দাও, তোমরা স্বেচ্ছায় খরচ কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের পক্ষ থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না। নিশ্চয়ই তোমরা একটি দুষ্কর্মপরায়ণ জাতি। তাদের কাছ থেকে, তাদের আর্থিক কুরবানী গৃহীত হবার (বিষয়ে) এছাড়া আর কোন কিছুই তাদের বঞ্চিত করে নি যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে আর তারা নামাযে আসতো চরম আলস্যের সাথে এবং খরচ করতো (গভীর) ঘৃণার সাথে।'
(সূরা আত্ তওবা: ৫৩-৫৪)

এসব আয়াত মুনাফেকদেরকে দুষ্কৃতকারী আখ্যায়িত করার পাশাপাশি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অস্বীকারকারী আখ্যা দিয়েছে। পুনরায় তাদের কুফরীর ভয়াবহতার বিষয়টি আরো বিশদভাবে এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন,

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۗ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

অর্থাৎ 'তারা আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলে, তারা বলে নি অথচ তারা অবশ্যই কুফরী-বাক্য বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের
পর তারা কাফির হয়ে গেছে। আর তারা এমন বিষয় হস্তগত করার দৃঢ় সংকল্প রাখত যা তারা অর্জন করতে পারে নি। আর
আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল নিজ অনুগ্রহে মু'মিনদেরকে সম্পদশালী করে দেয়ার কারণেই তারা (তাদের প্রতি) বিদ্বেষ পোষণ করেছে।
অতএব তারা তওবা করলে তা হবে তাদের জন্য উত্তম। তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্ তাদেরকে
এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। আর সারা পৃথিবীতে তাদের কোন বন্ধু বা কোন সাহায্যকারীও হবে না।' (সূরা আত্ তওবা: ৭৪)

অনুরূপভাবে সূরা আত্ তওবার ৬৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন, তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ। لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (সূরা আত্ তওবা: ৬৬) অর্থাৎ তোমরা কোন সাফাই গেয়ো না। لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ অর্থাৎ তোমরা কোন সাফাই গেয়ো না। নিশ্চয় তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ। অনুরূপভাবে মুনাফেকদের সম্পর্কে একটি গোটা সূরা আল্ মুনাফিকুন অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলেছেন,

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ○ (المنافقون:3-4)

অর্থাৎ তাদের কসমকে তারা ঢাল বানিয়ে রেখেছে। অতএব তারা আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তারা যে কর্ম করে অবশ্যই তা অত্যন্ত মন্দ, এর কারণ হলো, তারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে। কাজেই তাদের হৃদয়গুলোতে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, তাই তারা বুঝতে পারছে না। এখানেও এসব লোকের ঈমান আনা এবং এরপর আবার কুফরী করার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করা হয় নি আর দেওয়াও হয় নি।

মোটকথা এধরনের অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোতে এমন মানুষের উল্লেখ রয়েছে যারা ঈমান আনে আর এরপর প্রকাশ্যে বা কর্মের দিক থেকে কুফরী করে তাদেরকে ফাসেক, কাফির এবং মুরতাদ বলা হলেও তাদের জন্য হত্যা বা এধরনের অন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করেন নি।

মহানবী (সা.) মুরতাদ লোকদের সম্পর্কে কী বলেন? কুরআন করীমের পর আমরা দেখি, যে পবিত্র সত্তার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যিনি 'কানা খুলুকুহুল কুরআন' (অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতি হুবহু কুরআন)-এর সত্যায়নকারী ও সত্যায়নস্থল ছিলেন এবং যিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে কুরআন করীমের বিধিনিষেধ বাস্তবায়ন করে নিজের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেই পবিত্র সত্তা মুরতাদ সম্পর্কে কী বলেছেন?

বুখারী শরীফে নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, মুরতাদের জন্য কেবল ধর্মত্যাগের অপরাধের কারণে শরিয়তের কোন শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। এই হাদীসের শব্দগুলো হল, হযরত জাবের

বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, এক আরব বেদুঈন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে তাঁর (সা.) হাতে বয়আত করার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তী দিন মদীনায় সেই আরব বেদুঈনের জ্বর হলে সে মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে বলে, আমার বয়আত আমাকে ফিরিয়ে দিন। অতঃপর সে আবার এসে বলে, আমার বয়আত আমাকে ফিরিয়ে দিন। তিনি (সা.) তিনবার অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন এবং তাকে কোন উত্তর দেন নি। এরপর সেই আরব বেদুঈন মদীনা থেকে চলে যায়। তখন মহানবী (সা.) বলেন, মদীনা একটি ভাঁটির ন্যায়। এটি ময়লা-আবর্জনা বের করে দেয় এবং মূল জিনিসকে খাঁটি বানিয়ে দেয়।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলুল মাদীনা, হাদীস- ১৮৮৩)

হযরত মওলানা শের আলী সাহেব তার পুস্তক 'কাতলে মুরতাদ অওর ইসলাম'-এ এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এই পুস্তকটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) -এর তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছিল। এরপর তিনি লিখেন, সেই ব্যক্তির মহানবী (সা.)-এর নিকট বারবার আসাটাও প্রমাণ করে যে, মুরতাদের জন্য হত্যার শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। অন্যথায় সে কখনো মহানবী (সা.)-এর নিকট আসতো না বরং কাউকে কিছু না বলে গোপনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করত এবং কারো কাছে প্রকাশই করতো না যে, সে মুরতাদ হতে চায়। অতঃপর তিনি লিখেন, আমাদেরকে বলা হয়ে থাকে, ইসলামী শরিয়তে ধর্মত্যাগকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল, লোকেদেরকে যেন ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে বাধ্য করা যায়। একথা যদি সত্য হয় তবে লোকটি যখন বারবার মহানবী (সা.)-এর নিকট আসছিল তখন তিনি (সা.) কেন তাকে সতর্ক করেন নি? আর কেনই-বা একথা বলে দেননি যে, স্মরণ রেখো! ইসলামে ধর্মত্যাগের শাস্তি কিন্তু মৃত্যুদণ্ড। তুমি যদি ধর্মত্যাগ কর তাহলে তোমাকে হত্যা করা হবে। আর যেখানে সে বারবার ধর্মত্যাগের ইচ্ছা ব্যক্ত করছিল এবং ভয়ও ছিল যে, সে মুরতাদ হয়ে চলে যাবে, এহেন পরিস্থিতিতে কেন পাহারা বসানো হয় নি যাতে সে মুরতাদ হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ধরে তার ওপর শরিয়তের শাস্তি আরোপ করা সম্ভব হয়। সাহাবীরা কেন তাকে এটি বললেন না যে, মিয়াঁ! জীবনের মায়া থাকলে ধর্মত্যাগের নামও নিও না, কেননা এই শহরের রীতি হল, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে আবার ধর্মত্যাগী হয় তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়। অতএব এই আরব বেদুঈনের বারংবার ধর্মত্যাগের কথা বলা এবং মহানবী (সা.)-এর নিকট তার বারবার যাওয়া আর তার ধর্মত্যাগের পরিণাম সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর তাকে সতর্ক না করা এবং সাহাবীদেরকে তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ না শুনানো আর অবশেষে কোন বাধাবিঘ্ন ছাড়াই মদীনা থেকে তার চলে যাওয়া- এ সবগুলো বিষয়ই সুস্পষ্টভাবে একথার স্পষ্ট স্বাক্ষী যে, ইসলামে মুরতাদের জন্য কোন শরিয়তী শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। এছাড়া তার চলে যাওয়ার পর মহানবী (সা.)-এর এক ধরনের আনন্দ প্রকাশ করা এবং একথা বলা যে, মদীনা একটি চুল্লীর ন্যায় যা ময়লা-আবর্জনাকে খাঁটি ধাতু থেকে পৃথক করে দেয়- এটি প্রমাণ করে যে, তিনি (সা.) এই নীতিবিরোধী ছিলেন যে, কাউকে জোর করে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত রাখা হবে এবং মানুষকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মত্যাগ থেকে বিরত রাখা হবে। বরং অপবিত্র মানুষ মুসলমানদের জামা'ত থেকে পৃথক হয়ে গেলে তিনি (সা.) এতে অসন্তুষ্ট হতেন না। এছাড়া তিনি (সা.) তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ইসলামে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করতেন না। বরং এমন লোকের চলে যাওয়া যেন তাঁর দৃষ্টিতে আবর্জনা কমে আপদ কাটার মত বিষয়। মহানবী (সা.)-এর যদি এ নীতি থাকত যে, কেউ একবার ইসলামে প্রবেশ করলে তাকে সম্ভাব্য সব উপায়ে ইসলামে থাকতে বাধ্য করতে হবে আর যদি সে কোনভাবেই না মানে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে, যাতে তার দৃষ্টান্ত অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় হয়, এমন পরিস্থিতিতে উচিত ছিল সেই বেদুঈন চলে যাওয়াতে তাঁর (সা.) অসন্তুষ্ট হওয়া এবং সাহাবীদের ভর্ৎসনা করা যে, তোমরা তাকে কেন যেতে দিলে এবং কেন তাকে ধরে হত্যার হুমকি দিলে না? তাঁর (সা.) উচিত ছিল সাহাবীদের নির্দেশ দেওয়া যে, ছুটে যাও! যেখান থেকে পাও এই নোংরা ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আস যেন তাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া যায়। কিন্তু তিনি (সা.) এমনটি করেন নি। বরং ভিন্ন আঙ্গিকে বলেছেন, তার চলে যাওয়াতে ভালোই হয়েছে। কেননা সে মুসলমানদের মাঝে থাকার যোগ্য ছিল না। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে তাকে আমাদের থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। মোটকথা এই আরব বেদুঈনের দৃষ্টান্ত এ বিষয়ের একটি অকাট্য এবং সুনিশ্চিত প্রমাণ যে, শরীয়তে মুরতাদের জন্য কোন শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। এছাড়া কোন মুরতাদকে কেবল তার ধর্মত্যাগের কারণে হত্যা করার কোন রীতি মুসলমানদের মধ্যে কখনোই ছিল না।

(কাতলে মুরতাদ অউর ইসলাম, প্রণেতা-মৌলবী শের আলি সাহেব, পৃ: ১০৯-১১১, প্রকাশকাল: ১৯২৫)

শরীয়তে মুরতাদের জন্য কোন শাস্তি নির্ধারিত না থাকার দ্বিতীয় প্রমাণ হল, সেসব শর্ত যেগুলোর ভিত্তিতে মহানবী (সা.) হুদায়বিয়াতে মক্কার মুশরেকদের সাথে সন্ধি করেছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কিত হাদীসে উল্লেখ আছে , হযরত বারা বিন আযেব (রা.) হতে বর্ণীত হয়েছে, মহানবী (সা.) হুদায়বিয়ার দিন মুশরেকদের সাথে তিনটি বিষয়ে সন্ধি করেন। প্রথম শর্ত হল, মুশরেকদের মধ্য থেকে কেউ মুসলমান হয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলে তিনি তাঁকে মুশরেকদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। দ্বিতীয় শর্ত হল, মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ যদি মুরতাদ হয়ে মুশরেকদের কাছে চলে যায় তাহলে মুশরেকরা তাকে তাদের কাছে ফেরত পাঠাবে না।

(সহী বুখারী, কিতাবুস সুলাহ)

এই চুক্তিপত্রের দ্বিতীয় শর্ত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মুরতাদের জন্য কোন শরীয়তসম্মত শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। কেননা ইসলামে যদি ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত থাকত তাহলে তিনি (সা.) কখনোই শরীয়তের শাস্তির বিষয়ে মুশরেকদের কথা মেনে নিতেন না। এছাড়াও এমন আরো কয়েকটি ঘটনা রয়েছে যা থেকে সুস্পষ্ট যে, মহানবী (সা.)-এর কল্যাণময় যুগেই কিছু লোক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলেও নিছক ধর্মত্যাগের কারণে তাদের মোকাবিলা করা হয় নি যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ ও বিদ্রোহের মত গহীত কাজে লিপ্ত হয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতের মাধ্যমেও এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন আর সে আয়াতটি হল 'ওয়া মা আলার রাসূলে ইল্লাল বালাগুল মুবীন'। তিনি (রা.) বলেন, এ আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তরবারির পরিবর্তে তবলীগের মাধ্যমে কাজ করা একটি প্রাচীন নীতি। হযরত ইব্রাহীম (আ.)ও এ নীতিই অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর যুগের লোকদের প্রতিও আল্লাহ্ তা'লার এ নির্দেশই ছিল যে, আমাদের এ রসূলের দায়িত্ব কেবল বার্তা পৌঁছে দেওয়া, বলপূর্বক তরবারির মাধ্যমে মানানো নয়। গোটা কুরআনের সারকথা এটিই যে, দলিলপ্রমাণের মাধ্যমে কোন বিষয় মানানোই ধর্মানুসারীদের কাজ, জোরপূর্বক নয়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, আজও বিশ্ববাসী এ বিষয়টি বুঝে নি, বরং মুসলমানরা নিজেরাও মুরতাদদের হত্যা করাকে বৈধ মনে করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অথচ কারো বিশ্বাস সত্য হোক বা মিথ্যা তাকে সবসময় তেমনই সত্য মনে করা হয় যেভাবে একজন মুসলমান তার ধর্মকে সত্য মনে করে। খ্রিষ্টধর্ম মিথ্যা হলেও প্রশ্ন হল, বিশ্বের অধিকাংশ খ্রিষ্টান খ্রিষ্টধর্মকে কী মনে করে? তারা নিঃসন্দেহে একে সত্য মনে করে। হিন্দুধর্ম মিথ্যা, কিন্তু প্রশ্ন হল, বিশ্বের অধিকাংশ হিন্দু নিজ ধর্মকে কী মনে করে? তারা নিঃসন্দেহে একে সত্য মনে করে। ইহুদী ধর্ম নিঃসন্দেহে এখন সত্য নয়, কিন্তু প্রশ্ন হল, ইহুদীদের অধিকাংশ লোক ইহুদী ধর্মকে কী মনে করে? তারা নিঃসন্দেহে একে সত্য মনে করে। অতএব, 'আমি মনে করি আমার ধর্ম সঠিক অন্যের ধর্ম নয় -এ কথার উপর ভিত্তি করে যদি কাউকে হত্যা করা বৈধ হয়ে থাকে, এটাই যদি নীতি হয়ে থাকে তাহলে কোন মুসলমানকে হত্যা করার অধিকার কেন একজন খ্রিস্টানের থাকবে না? অন্যদেরকে জোরপূর্বক হিন্দু বানানোর অধিকার কেন একজন হিন্দুর থাকবে না? চীনে কনফুশিয়াস ধর্মের অনুসারীরা কেন জোরপূর্বক সেদেশের লোকদের তাদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অধিকার পাবে না? ফিলিপাইন যেখানে এখনো পনেরো বিশ হাজার মুসলমান রয়েছে (এটি সেযুগের কথা যখন তিনি একথা বলছেন, এখন তো এ সংখ্যা আরো বেশি) সেখানকার মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানোর অধিকার কেন খ্রিষ্টানদের থাকবে না? আমেরিকা কেন তাদের দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানানোর অধিকার পাবে না? রাশিয়া কেন সবাইকে খ্রিষ্টান বা কমিউনিস্ট বানিয়ে নেয়ার অধিকার পাবে না? মুসলমানরা যদি জোরপূর্বক অন্যদেরকে নিজ বিশ্বাসে দিক্ষিত করতে পারে তাহলে যৌক্তিকভাবে একই অধিকার অন্যরাও প্রাপ্য। কিন্তু এই অধিকার প্রবর্তন করে কি বিশ্বে কখনো শান্তি বজায় থাকতে পারে?

এই অধিকার প্রবর্তন করে কি তোমরা নিজ স্ত্রী পুত্রকে বলতে পার যে এটি সঠিক- মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানোর অধিকার খ্রিস্টানদের আছে? খ্রিস্টানদের জোরপূর্বক মুসলমান বানানোর অধিকার মুসলমানাদের আছে? হানাফীদের শিয়া বানানোর অধিকার ইরানীদের আছে? আর সবাইকে জোরপূর্বক সুন্নী বানানোর অধিকার হানাফীদের আছে? বস্তুত, এটি এমন এক বিবেক পরিপন্থী কথা, কোন মানুষ এক মিনিটের জন্যও এটি মেনে নিতে পারে না। পূর্ববতী নবীদের জাতি যখনই ঐশী হেদায়েত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তখন খোদা তা'লা তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, اَنُلۡزِمُكُمُوۡهَا وَاَنۡتُمۡ لَهَا كٰرِهُوۡنَ অর্থাৎ তোমরা যদি নিজেরা হেদায়েত গ্রহণ করা পছন্দ না কর তাহলে আমরা জোরপূর্বক তোমাদেরকে হেদায়েত দিতে পারি না। (সূরা হুদ: ২৯) কিন্তু আক্ষেপ, বর্তমান যুগের মুসলমানদের মাঝে এই মূলনীতির অস্বীকারকারীও বিদ্যমান আছে। আর এযুগে আমরা দেখি, মুসলমানদের অধিকাংশ একই কথা বলে। বিশ্ববাসী যদি এ বিষয়টি বুঝে যায় তাহলে নির্ঘাত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াদিতে অন্যায় অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষ নিজের বিশ্বাস অন্যের ওপর জোরপূর্বক

চাপিয়েও দিবে না আর নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ অন্যান্য দেশে জোরপূর্বক চালানোর চেষ্টাও করবে না। ”

(তফসীর কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬০৬-৬০৭)

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি জানি না, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কোত্থেকে এবং কার কাছ থেকে শুনেছে যে, ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, লা ইকরাহা ফিদ্দীন অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে কোনরূপ বলপ্রয়োগ নেই। তাহলে বলপ্রয়োগের নির্দেশ কে দিয়েছে? আর জবরদস্তি করার সুযোগই বা কোথায়? প্রশ্ন হলো যাদেরকে বলপ্রয়োগে মুসলমান বানানো হয় তাদের কি এমনই সততা ও নিষ্ঠা এবং ঈমান থাকে যে, কোনরূপ বেতন-ভাতা না পাওয়া সত্ত্বেও এবং মাত্র দু'তিন শত জন হয়েও এক হাজার লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে! আর তাদের সংখ্যা যখন হাজারের কোটায় উপনীত হয় তখন তারা লক্ষ শত্রুকে পরাজিত করে এবং ধর্মকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ছাগল-ভেড়ার ন্যায় প্রাণ বিসর্জন দেয় আর এভাবে ইসলামের সত্যতায় নিজেদের রক্ত দিয়ে মোহর অঙ্কিত করে। আর তারা খোদার একত্ববাদ প্রচারের জন্য এমনই নিবেদিত প্রাণ হবে যে, দরবেশসুলভ কষ্ট-কাঠিন্য সহ্য করে আফ্রিকার মরুভূমি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং সেই দেশে ইসলামের বিস্তার ঘটাবে। শুধু তাই নয়, সব ধরনের ক্লেশ-কাঠিন্য সহ্য করে সুদূর চীন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে, যুদ্ধ করে নয় বরং কেবলমাত্র দরবেশী জীবন অবলম্বন করে। অতঃপর সেদেশে পৌঁছে ইসলামের প্রচার কাজ করে, ফলে তাদের বরকতময় উপদেশ বাণী শুনে কয়েক কোটি মুসলমান এই ভূ-খণ্ডে জন্ম লাভ করে। এরপর মোটা কাপড় পড়ে দরবেশ বেশে তারা হিন্দুস্তানে আসবে এবং আর্যাবর্ত্যের অনেকাংশকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করবে এবং ইউরোপের সীমান্ত পর্যন্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র ধ্বনী পৌঁছে দেবে। সত্য অন্ত:করণে তোমরা বল, এসব কী তাদের কাজ হতে পারে যাদেরকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয় আর যাদের হৃদয় কাফের আর মুখ মুমিন হয়ে থাকে? না, বরং এটি তাদের কাজ যাদের হৃদয় ঈমানের জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং যাদের হৃদয়ে কেবল খোদাই বিরাজমান থাকেন। ”

(পয়াগামে সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪৬৮-৪৬৯)

উপরোক্ত কুরআনের আয়াতসমূহ এবং নির্দেশাবলীর আলোকে এটি প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যদি মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড না হয়ে থাকে তাহলে হযরত আবু বকর (রা.) মুরতাদদেরকে কেন হত্যা করেছেন এবং মৃত্যুদণ্ডাদেশ কেন দিয়েছেন।

প্রকৃত বিষয় হল, ইতিহাস অধ্যয়নের ফলে খুব সহজে এটি স্পষ্ট হয় যে, হযরত আবু বকরের যুগে মুরতাদরা কেবল মুরতাদই ছিল না, বরং তারা বিদ্রোহী ছিল এবং রক্তপিপাসু বিদ্রোহী ছিল যারা কেবলমাত্র মদিনা রাষ্ট্রে আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে হত্যা করার ভয়ংকর ষড়যন্ত্রই করেনি, বরং বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদেরকে ধরে ধরে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তাদের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। তাদেরকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এ সকল মুরতাদ অন্যায়-অবিচার, হত্যা ও লুণ্ঠন, বিদ্রোহ এবং লুটপাটের ন্যায় ভয়ংকর অপরাধে লিপ্ত লোক ছিল যার কারণে প্রতিরক্ষা এবং প্রতিশোধমূলকভাবে সে সমস্ত যুদ্ধবাজদের সাথে লড়াই করা হয়েছে এবং জাযাউ সাইয়েআতিন সাইয়েতুম মিসলুহা-এর শিক্ষা অনুযায়ী তাদেরকেও সমপরিমাণ শাস্তি দিয়ে মৃত্যুদন্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যেরূপ অপরাধ তারা করেছিল। যেমন, ইতিহাস ও সীরাতের পুস্তকাবলী থেকে কিছুটা বিস্তারিত উপস্থাপন করা হচ্ছে।

তারীখে খামীসে উল্লিখিত আছে,অন্যতম একজন মুরতাদ হলো খারেজা বিন হিসম। সে তার জাতির কতক অশ্বারোহী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়। সে মদিনাবাসীদের (আত্মরক্ষা কল্পে) যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার পূর্বেই বাধা দিতে চাইত অথবা তাদেরকে উদাসীন পেয়ে আক্রমণ করে বসত। যেমন সে হযরত আবু বকর এবং তার মুসলমান সাথীদের উপর সেই সময় আক্রমণ করে বসে যখন তারা অসতর্ক ছিল।

(তারিখুল খামিস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৩)

মুরতাদরা কেবলমাত্র মদিনায় আক্রমণই করেনি, বরং যখন হযরত আবু বকর (রা.) তাদেরকে পরাজিত করলেন তখন তারা সেসব এলাকায় বসবাসকারী নিষ্ঠাবান মুমিন মুসলমানদের হত্যা করে (যেমনটি গত খুতবায় আমি এর কিছুটা উল্লেখ করেছি) এবং যারা স্বীয় জাতি মুরতাদ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যেমন আল্লামা তাবারী লিখেন, হযরত আবু বকর যখন বিভিন্ন আক্রমণকারী গোত্রকে পরাস্ত করেন তখন বনু যুবইয়ান এবং আবস সেই সমস্ত মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে যারা তাদের মাঝে বসবাস করত এবং তাদেরকে যেভাবে পেরেছে হত্যা করেছে একইভাবে অন্যান্য গোত্রও তাদের ন্যায় কাজ করেছে অর্থাৎ, তারাও এমন লোকদেরকে হত্যা করেছে যারা ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৬)

আল্লামা ইবনে আসীর লিখেন, আবস এবং যুবইয়ান গোত্র তাদের এলাকায় বসবাসকারী নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা আরম্ভ করে দেয় এবং তাদের দেখাদেখি অন্যান্য গোত্রও একই কাজ করে। তখন হযরত আবু বকর সংকল্পবদ্ধ হন যে, তিনি সেই সমস্ত গোত্রের সেসব লোককে অবশ্যই হত্যা করবেন যারা মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়াতু লি ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃ: ৩১০)

যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর অন্তর্ধানের পর যেসব গোত্র মুরতাদ হয়েছে তাদের মুরতাদ হওয়া ধর্মীয় মতবিরোধ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। নিজেদের হাতে তরবারি ধারণ করেছিল, মদীনা মুনাওয়ারায় আক্রমণ করেছে, স্ব স্ব গোত্রের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আগুনে নিক্ষেপ করেছে, মুসলা (অর্থাৎ মৃতদেহ বিকৃত) করেছে। যেমনটি তাবারীর ইতিহাসে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এর উল্লেখ করে লিখেছে, যখন আসাদ এবং গাতফান, হাওয়াযিন এবং সুলায়েম ও তায় গোত্র পরাস্ত হয় তখন খালেদ তাদের ক্ষমার আবেদন মঞ্জুর করেননি, যতক্ষণ না তারা তার কাছে সেই সমস্ত লোকদেরকে ধরে নিয়ে এসেছিল যারা মুরতাদ অবস্থায় মুসলমানদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়িয়েছে, তাদের লাশগুলোকে বিকৃত করেছে এবং তাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন করেছে।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

আল্লামা ইবনে খলদুন লিখেছেন, আরব উপদ্বীপের এই মুরতাদ গোত্রগুলো হযরত আবু বকর এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করে।

(তারিখ ইবনে খালদুন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৬)

তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সর্বপ্রথম আবস ও যুবইয়ান আক্রমণ করে। যার ফলে হযরত আবু বকর (রা.) কে হযরত উসামা (রা.)-এর ফেরত আসার পূর্বেই তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

(তারিখুত তাবারী লি ইবনে জারিরুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৪)

আল্লামা ইবনে খালদুন লেখেন, রাবিয়া গোত্র মুরতাদ হয়ে যায়। তারা মুনযের বিন নো'মান কে দাঁড় করিয়েছিল যে মাগরুর নামে পরিচিত ছিল। তারা তাকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়।

(তারিখ ইবনে খালদুন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৯-৪৪০)

বুখারীর ব্যাখ্যাকারী আল্লামা আইনি লিখেন, হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, কেননা তারা তরবারির জোরে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল।

(উমদাতুল ক্বারী, কিতাবু ইসতেবাতুল মুরতাদীন ওয়াল মুয়ানিদীন, খণ্ড-২৪, পৃ: ১২২)

আল্লামা শওকানী বর্ণনা করেন, ইমাম খাত্তাবী হযরত মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর মুরতাদ এবং যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় লেখার পর লিখেন, এরা মূলত বিদ্রোহী ছিল। এরা ধর্মত্যাগীদের দলে যোগ দিয়েছিল বলে এদেরকে মুরতাদ বলা হয়েছিল।

(নিয়ালুল আওতার লি আল্লামা মহম্মদ আশশাওকানী, কিতাবুয যাকাত: পৃ: ৭২৪, দারুল কিতাবুল আরবী, বেইরুত, ২০০৪)

একজন লেখক তার পুস্তকে বারবার ধর্মত্যাগীদের জন্য বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহী জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন, তিনি বলেন, যখন মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর সংবাদ সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে এবং সব দিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে, তখন বিদ্রোহের অগ্নিশিখা সবচেয়ে বেশি জ্বলছিল ইয়েমেনে । যদিও বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বালনকারী ব্যক্তি আনসি নিহত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বনু হানীফার মুসায়লামা এবং বনু আসদ গোত্রের তুলায়হা নবুয়তের দাবি করে হাজার হাজার মানুষকে নিজেদের সাথে ভিড়িয়েছিল। মানুষ বলাবলি শুরু করে দেয় যে, আসাদ এবং গাতফানের মিত্র গোত্রগুলোর নবী সর্বদাই কুরাইশদের নবী থেকে বেশি প্রিয়। কেননা মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন আর তুলায়হা জীবিত। যখন এসব বিদ্রোহের খবর হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে পৌঁছায় তখন তিনি বলেন যে, আমাদের ততক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত এই অঞ্চলের কর্মকর্তা এবং আমীরদের থেকে পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন না আসবে। বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি, বিভিন্ন কর্মকর্তা ও আমীরদের পক্ষ থেকে রিপোর্ট আসা শুরু হয়। এসব রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, বিদ্রোহীদের হাতে শুধুমাত্র দেশের শান্তি -শৃঙ্খলাই হুমকির মুখে ছিল না, বরং সেসব মানুষের জীবনও হুমকির সম্মুখিন ছিল যারা ধর্মত্যাগের স্রোতে বিদ্রোহীদের সাথে বয়ে যায় নি। বরং ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর

কাছে পূর্ণ শক্তির সাথে বিদ্রোহ দমন করা এবং বিদ্রোহীদের যে কোন মূল্যে দমন করে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ১৩১)

এক লেখক লিখেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৃষ্টি সেসব মুরতাদদের দমনের প্রতি ছিল যারা আরবের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহের আগুনে ঘি ঢালছিল এবং যাদের হাতে ইসলামের আলোকবর্তিকা এবং তার অনুসারীদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে ছিল।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার, প্রণেতা-আবুন নাসার, পৃ: ৬০৩)

আবার একজন লেখক লিখেন, মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর আরবের অনেক নেতা মুরতাদ হয়ে যায় এবং আর সকলেই নিজ নিজ এলাকার স্বাধীন শাসক বনে বসে। গবেষকদের মতে এই বিদ্রোহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ছিল, ধর্মীয় কারণে ধর্মত্যাগ খুব কমই হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর ইহজীবনের শেষ দিনগুলোতে আরবের কিছু গোত্র প্রধানরা তাদের রাজনৈতিক বিদ্রোহকে ধর্মীয় রূপ দিতে নবী হওয়ার দাবি করে বসে।

(খোলাফায়ে রাশেদীন, প্রণেতা- হাকীম মাহমুদ যাফর, পৃ: ৫৮)

যাহোক এ ধারা চলমান রয়েছে। এর বাকি অংশ আগামীতে অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। এসব ঐতিহাসিক বর্ণনার সারমর্ম হলো, মুরতাদ গোত্রগুলো যাকাতের অর্থ আটকে রেখেছিল। অর্থাৎ, সরকারের কর জোরপূর্বক আটকে রেখেছিল। কোন কোন জায়গায় যাকাতের অর্থ লুটপাট করেছিল। যাকাতের সম্পদ লুট করে, সৈন্য প্রস্তুত করে, রাজধানী মদিনায় আক্রমণ করে। যেসব মুসলমান মুরতাদ হতে অস্বীকার করেছিল তাদের হত্যা করে, কাউকে আগুনে জীবিত জ্বালিয়ে হত্যা করে। এজন্য এসব মুরতাদ, সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ, সরকারের সম্পদ লুটপাট এবং মুসলমানদের হত্যা এবং তাদেরকে জীবন্ত জ্বালানোর দায়ে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য ছিল। যেমনটি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (সূরা শুরা: ৪১)। অর্থাৎ, অপরাধী যেরূপ অপরাধ করে তাকে সেরূপই শাস্তি দাও। অপর এক স্থানে বলা হয়েছে

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

(সূরা মায়েদা: ৩৪)। অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে, অর্থাৎ, যারা রসূল এবং খলীফাতুর রসূল বা ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কেননা আল্লাহ্‌র সাথে লড়াই করা সম্ভব নয়, আল্লাহ্‌কে না থাপ্পড় মারা যায় আর না পাথর, তির ও তরবারি (দ্বারা আঘাত করা যায়)। তাই তাদের সাথে যুদ্ধ করার অর্থ হলো, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا অংশে এই কথার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধের অর্থ কী। এর ব্যাখ্যা হলো, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে। অর্থাৎ দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, হত্যা, লুটপাট, ডাকাতি, রাহাজানি, লাশের বিকৃতি এবং বিদ্রোহ করে; তাদের শাস্তি হলো, يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا অর্থাৎ তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা উচিত অথবা ক্রুশে ঝুলিয়ে মারা উচিত। যাহোক যেমনটি আমি বলেছি, এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

এখন আমি কতিপয় মরহুমেরও স্মৃতিচারণ করতে চাই, নামাযের পর যাদের (গায়েবানা) জানাযাও পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হবে মুকাররম মুহাম্মদ বশীর শাদ সাহেবের, যিনি অবসরপ্রাপ্ত মুরব্বী সিলসিলাহ্ ছিলেন, আজকাল তিনি আমেরিকায় বসবাসরত ছিলেন। তিনি ৯১ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা ১৯২৬ সনে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ১৯৪৫ সনে তিনি মাধ্যমিক পাশ করার পর মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হন। ১৯৫২ সনে আরবীতে ফাযেল পরীক্ষা কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। ১৯৫৪ সনে রাবওয়ার জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর এক বছর পর্যন্ত চিকিৎসা বিষয়ক পড়ালেখা করেন। ৫৬ থেকে ৫৭ সন পর্যন্ত তিনি ওকালতে তবশীর রাবওয়ায় সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৫৮ সনে তিনি সিয়েরা লিওন চলে যান, সেখানে মুবাল্লেগ হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। সেখানে বিভিন্ন স্থানে তিনি কাজ করার তৌফিক লাভ করেছেন। সেখানে অর্থাৎ, সিয়েরা লিওনে তিনি প্রেসেরও প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তার নিযুক্তি সেখান থেকে নাইজেরিয়ায় হয়। সেখানেও তিনি ভালো কাজ করেন। তিন বছর পর নাইজেরিয়া থেকে তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। অতঃপর ১৯৬৪ সনে তাকে পুনরায় নাইজেরিয়া প্রেরণ করা হয়। ৬৭ সনে মরহুম বেনিনে তবলীগি সফরে যান। সেখানে তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় স্থানীয় অধিবাসীদের তবলীগের মাধ্যমে বয়াত করানোর তৌফিক পেয়েছেন। ১৯৭০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর আফ্রিকা সফরকালে তিনি যখন কানু আগমন করেন, তখন তিনি হুযূরের সমীপে ১০০ জন নব আহমদীর উপহার দেন। এতে হুযূর (রাহে.) সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, দোয়া করান এবং নিজের পবিত্র পাগড়ীও বশীর শাদ সাহেবকে দান করেন। ১৯৭০ সনে তিনি যখন ফিরে আসেন তখন তিনি ওমরাহ্ করারও সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৩ সনে বেহেশতি মাকবেরা রাবওয়ার মজলিস কারপরদায-এর সেক্রেটারী হিসেবে মরহুমের নিযুক্তি হয়। ১৯৮৪ সনে জামা'তের বিরুদ্ধে যে অধ্যাদেশ জারী করা হয়েছিল, এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে হিজরত করতে হয়। হিজরতের পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর উপস্থিতিতে যে খুতবা দেয়া হয়েছিল, সেটি তিনি প্রদান করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই দিক থেকে (জামা'তের) ইতিহাসেও তার নাম উল্লেখ রয়েছে। ১৯৮৮ সনে মরহুম ব্যক্তিগত পরিস্থিতির কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর কাছে অবসর মঞ্জুর করার আবেদন করেন, যা গৃহীত হয়। এরপর তিনি আমেরিকা চলে যান। তার শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া নাসরিন আক্তার শাদ সাহেবা আর এক পুত্র এবং চার কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে মাগফিরাত এবং কৃপার আচরণ করুন। আর তার সন্তানদেরও পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো রানা মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেবের। যিনি শিয়ালকোট জেলার মালিয়াঁওয়ালা নিবাসী রানা ইলম দ্বীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনিও কিছুদিন পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমের পিতা ১৯৩৮ সনে কাদিয়ানে গিয়ে বয়আত করেছিলেন। মরহুম নামায রোযা পালনকারী ছিলেন, তাহাজ্জুদ পড়তেন, দোয়াগো ছিলেন, অনেক সাহসী এবং নির্ভীক মানুষ ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। যুগ খলীফার নির্দেশ পালনকারী ছিলেন। নিজের সকল সন্তানকে সর্বদা জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকার এবং খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শনের নসীহত করেছেন। ১৯৭৪ এবং ৮৪ সনে জামা'তের বিরোধিতার কারণে তাকে অনেক কঠিন পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তিনি অনেক অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি তাঁর অবর্তমানে ছয় পুত্র এবং এক কন্যা রেখে গেছেন। তার এক পুত্র রানা মুহাম্মদ আকরাম মাহমুদ সাহেব নাইজেরিয়াতে জামা'তের মুবাল্লেগ হিসেবে কর্মরত আছেন। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তিনি নিজ পিতার জানাযা এবং দাফনে অংশ নিতে পারেন নি। এর পূর্বে ২০১৮ সনে তার মাতাও মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তখনও তিনি যেতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধৈর্য ও মনোবল দিন এবং মরহুমের প্রতি মাগফিরাত ও কৃপা করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো ইসলামাবাদ নিবাসী মুকাররম ডক্টর মাহমুদ আহমদ খাযা সাহেবের। তিনি কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত করেছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছে তার পিতা খাজা মুহাম্মদ শরীফ সাহেবের মাধ্যমে। তিনি একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে তার বাকি পরিবার জামা'তের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও হযরত খলীফা সানী (রা.)-এর যুগে বয়আত করেছিলেন। খুবই পুণ্যবান প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তিন বার স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর বয়আত করার নির্দেশ দেন। অবশেষে তিনি বয়আত করেন। ডক্টর মাহমুদ খাজা সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন পেশাওয়ারে। এরপর ১৯৬৬ সনে পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এম. এস. সি. ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ১৯৭৩ সনে অস্ট্রেলিয়ার ম্যালবোর্ন এর লাট্রোব বিশ্ববিদ্যালয় (খধ ঞৎড়নব টহরাবৎংরঃু) থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পাকিস্তানেও এবং বাহিরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াতেন। তিনি যখন ঘানায় ক্যাপকোস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন সেখানে আমার সাথে তার পরিচয় হয়। আমি দেখেছি, একান্ত সরল প্রকৃতির এবং বিনয়ী ও নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন। অনেক ভালো গবেষক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। গবেষক হিসেবে পাকিস্তানেও এবং বহির্বিশ্বেও তাকে বেশ সম্মান করা হতো। চৌধুরী ইকরামুল্লাহ্ সাহেবের কন্যা আমাতুল কাইয়্যুম সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়। তার এক পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে।

ডক্টর মাহমুদ খাজা সাহেব নুসরত জাহাঁ প্রকল্পের অধীনে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৪ সন পর্যন্ত সিয়েরা লিওনে সস্ত্রীক ওয়াকফ করার তৌফিক লাভ করেছেন। তার পুত্র ডাক্তার তারেক খাজা সাহেব বলেন যে, রমজান মাসে বিশেষভাবে পবিত্র কুরআন অনুবাদসহ অনেক প্রণিধান ও মনোযোগের সাথে পাঠ করতেন। এই কথার ওপর জোর দিতেন যে, খোদা ও তাঁর রসূল এবং খলীফার নির্দেশাবলী হুবহু উপস্থাপন করা উচিত। শব্দের সামান্য তারতম্যের কারণেও ভুল অর্থ গ্রহণ করা হতে পারে। ইসলামাবাদ জেলার আমীর আব্দুল বারী সাহেব লিখেন যে, আমার এবং খাজা সাহেবের নুসরত জাহাঁ প্রকল্পের অধীনে সিয়েরা লিওনে একসাথে কাজ করার সুযোগ

হয়েছে। পাকিস্তানে ফিরে এসে প্রথমে তিনি সরকারী অফিসে চাকরি আরম্ভ করেন। এরপর ইসলামাবাদ স্থানান্তরিত হন, যেখানে এস ডি পি আই-এ যোগ দেন। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সমাদ্রিত হন। আর অসাধারণ খ্যাতি সত্ত্বেও তিনি পরম নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। তিনি খাদ্যদ্রব্য, নিস্কাশন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য (রূপচর্চার) প্রসাধনী সামগ্রীতে মিশ্রিত ক্ষতিকর রাসায়নিক (উপাদান) মুক্ত করার ক্ষেত্রে অনেক কাজ করেছেন এবং এই কাজে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এ বিষয়ে অনেক পুস্তাকাদিও রচনা করেছেন। বারী সাহেব বলেন, যখনই তিনি (নতুন) কোন পুস্তক রচনা করতেন সেই বইয়ের একটি কপি আমাকেও পাঠাতেন। তিনি বলেন, এখন আমার কাছে তার (রচিত) অনেকগুলো বই রয়েছে। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। খিলাফতের সাথে (গভীর) ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। সর্বদা খাদেমদের তরবিয়তের জন্য তাদের দুর্বলতা সমূহ চিহ্নিত করতেন।

খাজা মাহমুদ সাহেব সম্পর্কে পাকিস্তান ছাড়াও জার্মানী, সুইডেন, বুরকিনাফাসু, আমেরিকা, আযারবাইজান, সুইজারল্যান্ড, নাইজেরিয়া, মিশর, বাহরাইনসহ আরও অনেক দেশের বিজ্ঞানী ও সরকারী মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবর্গ এবং বিশ্ববিদ্যলয়ের চ্যান্সেলার ও অধ্যাপক আর সুশীল সমাজের লোক ও এনজিওসমূহের প্রধানগণ শোকবার্তা প্রেরণ করেন। তাদের অসংখ্য (শোক) বার্তা এসেছে যা তার সন্তানেরা আমার কাছেও কিছু পাঠিয়েছে। নমুনাস্বরূপ দু'একটি শোকবার্তা পড়ে দিচ্ছি।

আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি থেকে World Alliance for Mercury Free Dentistry-এর সভাপতি জনাব চার্লস জি ব্রাউন (তার শোকবার্তায়) লিখেন, ডক্টর মাহমুদ খাজা অনন্য এক বুদ্ধিজীবি এবং বিরল এক সমাজসেবী ছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও বিষাক্ত পর্দাথসমূহের বিষয়ে তার উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক রচনাসমূহ; পান্ডিত্যের প্রসার এবং সরকারী ও বেসরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের ভিত্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত তার কয়েক দশকের চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিভিন্ন জাতির মাঝে বিদ্যমান চুক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে (এবং) সুশীল সমাজের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা আর পাকিস্তানের বিভিন্ন বিষাক্ত উপকরণ দূর করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাকে ২০১৯ সালে পি বি সি অর্থাৎ The Pacific Basin Consortium for Environment and Health Chairman পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ডক্টর মাহমুদের কৃতিত্বের মাঝে একটি আর্ন্তজাতিক চিকিৎসা সংস্থ ার সভাপতি হওয়া-ও অর্ন্তভুক্ত। এ পর্যন্ত নির্বাচিত সভাপতিগণের মাঝে তিনিই একমাত্র ডক্টর যিনি চিকিৎসক ছিলেন না, বরং পি এইচ ডি ডক্টর ছিলেন।

অনুরূপভাবে আরও অনেক বিজ্ঞানী তার প্রসংশা করেছেন যাদের মাঝে জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডের ডক্টরগণ-ও রয়েছেন। মহান আল্লাহ মরহুমের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার পরিবারপরিজনকে ধৈর্য দিন আর তার পুণ্যকর্মসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

****

১ম পাতার পর.....

করেন। আর তাদের উপর সত্য স্বপ্ন কা দিব্যদর্শনের দ্বার খুলে দেন। এবং তাদেরকে অদৃশ্যে গোপন রহস্যাবলী সম্পর্কে সংবাদ দেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে-

ফির বাহার আয়ি, খোদা কি বাত ফির পুরী হুই।

পুনরায় বসন্ত এসেছে। খোদা তা'লার কথা পুনরায় পূর্ণ হয়েছে।

এর মধ্যেও সেই রীতি কথা বর্ণনা করা হয়েছে। খোদা তা'লা একবার বসন্তে স্বীয় রহমতের নিদর্শন দেখিয়েছেন। তাই যখন বসন্ত আসে তখন আল্লাহ তা'লার রহমত বলে, এখন আমার বান্দা কি বলবে, তাই আমি পুনরায় নিদর্শন দেখাব। বান্দা যদি এর থেকে উপকৃত হয় তবে আগামী বসন্তে পুনরায় এই পুরস্কার নাযেল হয়। মোটকথা ঐশী বাণীকে বৃক্ষ হিসেবে কল্পনা করা হয়, তবে ঐশী গুণাবলীতে যে রীতির সামঞ্জস্য রয়েছে তা রমযানে তাকে উদ্বেলিত করে আর মোমেনকে তা টাটকা ফল দান করে।

এছাড়াও রোযা দ্বারা এভাবেও আধ্যাত্মিকতার উন্নতি ঘটে যে, মানুষ যখন খোদা তা'লার জন্য পানাহার বর্জন করে, তখন এর অর্থ হল খোদা তা'লার জন্য তার পথে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত আছে। আর যখন সে স্ত্রী থেকে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা ত্যাগ করে তখন তা একথার বহিঃপ্রকাশ যে, খোদা তা'লার জন্য সে নিজের সন্তানদেরকেও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছে। আর যখন সে রোযার মধ্যে এই দুই প্রকার নমুনা পেশ করে তখন সে খোদা তা'লার সঙ্গে সাক্ষাতের যোগ্যতা অর্জন করে নেয়। আর খোদা তা'লার সঙ্গে তৈরী হওয়া সম্পর্ক এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক দৃঢ় হওয়ার কারণে সে চিরতরে বিপথগামিতা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৯)

বিজয় কেবলমাত্র দোয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

এই যুগ যা পশ্চাতে আগমণকারীদের যুগ ,যার সঙ্গে ইসলামের বিজয় সম্পৃক্ত রয়েছে, আমরা জানি যে এই সকল বিজয় গুলি তরবারি বা বন্দুক বা তোপ ও কামানের দ্বারা হবেনা। এর জন্য সব থেকে বড় অস্ত্র দোয়া । তারপর সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের হাতিয়ার যা হযরত মসীহ মওউদ(আঃ)- কে দেওয়া হয়েছে। আর ইসলাম এরই মাধ্যমে ইনশাল্লাহ তায়ালা বিজয় লাভ করবে। এবং দোয়ার কবুলিয়াতের জন্য , আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্তির জন্য এবং বরকত অর্জন করার জন্য নবী (সাঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করার কথা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যা আমরা আয়াতে দেখেছি, এবং বিভিন্ন হাদিস থেকেও আমরা দেখেছি যে, আঁ হযরত (সাঃ) এর উপর দরুদ পাঠানো ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভব নয়। এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ও একথায় বলেছেন যে আমি যে মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছি তা কেবলমাত্র দরুদ পাঠ করার কারণেই সম্ভব হয়েছে। এবং ইসলামের ভবিষ্যতের বিজয় সমূহের সঙ্গেও এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি তাঁর নিজের মর্যাদা সম্পর্কে যা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মসীহ ও মাহদী হওয়ার কারণে প্রদান করেছেন , সে কথা বর্ণনা করার জন্য তিনি একটি ইলহামের প্রসঙ্গে বলে, " পরের যে ইলহামটি ছিল সেটি হল, এবং তুমি মহম্মদ (সাঃ) এর উপর দরুদ প্রেরণ কর এবং তাঁর বংশধরদের উপর, যিনি আদম সন্তানগণের নেতা এবং খাতামুল আম্বিয়া । এটা এবিষয়ের দিকে ইঙ্গিত দেয় যে এই সকল মর্যাদা, অনুকম্পা ও কৃপাবলী তাঁরই মাধ্যমে হয়েছে। এবং তাঁর সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্কের কারণে এই প্রতিদান। সুবহানাল্লাহ, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্দারের আল্লাহ তায়ালার দরবারে কতই না সুউচ্চ মর্যাদা আর কিরূপ নৈকট্য যে তাঁর প্রেমিক খোদা তায়ালার অনুরাগভাজন হয়ে যায়। এবং তাঁর সেবককে এক জগতের অধিপতি বানানো হয় ।" (অর্থাৎ জগত তার সেবকে পরিণত হয়)। "এই স্থানে আমার স্মরণে এল যে এক রাত্রিতে এই অধম এত অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়ল যে প্রাণ ও হৃদয় সুরভিত হয়ে উঠল। সেই রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখলাম যে (ফিরিস্তারা) শুদ্ধ ও শীতল পানীয় রূপে জ্যোতিতে পরিপূর্ণ মশক (চামড়ার থলে) এই অধমের গৃহে নিয়ে আসছে। এবং তাদের মধ্যে একজন বলল এগুলি ঐসকল বরকত যা তুমি মহম্মদ(সাঃ) এর প্রতি প্রেরণ করেছিলে।

এরকম আরও একটি বিচিত্র ঘটনা স্মরণে আসল , একদা ইলহাম হল যার অর্থ এই ছিল যে ফিরিস্তাদের স্থানে বাগ বিতণ্ডা চলছে। অর্থাৎ ধর্মের পুনর্জীবনের জন্য ঐশী ইচ্ছা উদ্বেলিত হচ্ছে।"(ধর্মকে নতুন রূপে জীবিত করার জন্য) "কিন্তু এখনও ফিরিস্তাদের নিকট নবজীবন দানকারীর নিযুক্তি উন্মোচিত হয়নি। (যে ব্যক্তি ধর্মকে জীবীত করবে তার সম্পর্কে জানা যাচ্ছেনা।) "এই জন্য তারা দ্বিধা বিভক্ত। এরই মধ্যে স্বপ্নে দেখি যে লোকেরা এক নবজীবন দানকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপর এক ব্যক্তি এই অধমের সম্মুখে উপস্থিত হল এবং ইঙ্গিত করে বলল رَسُوْلَ اللهِ অর্থাৎ ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি রসুলুল্লাহ(সাঃ) কে ভালবাসেন। এই কথার অর্থ এই ছিল যে , এই পদের জন্য সবচায়তে বড় শর্ত হল রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ভালবাসা। অতএব তা এই ব্যক্তির মধ্যে প্রমাণিত। (অর্থাৎ এর মধ্যে বিদ্যমান) "এবং উপরোক্ত ইলহাম যা রসুলের বংশধরদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করার আদেশ রয়েছে , এখানেও সেই গোপন রহস্য রয়েছে যে খোদা তায়ালার জ্যোতির যশ পৌছনোর বিষয়ে আহলে বায়ত (রসুলুল্লাহ সাঃ এর বংশধর) এর অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি খোদা তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় সে ঐসকল পবিত্র ও শুদ্ধ আত্মাদেরই উত্তরাধিকারী হয় এবং সকল জ্ঞানসমূহ ও তত্বজ্ঞানের অধিকারী বলে গণ্য হয়।

(বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ খন্ড)

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর নিউজিল্যাণ্ড সফর

অতিথিদের মতামত

নিউজিল্যাণ্ডের সংসদভবনে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শুনে অতিথিরা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। অনেকে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর তাদের অধিকাংশের উপলব্ধি, হুযুরের এই বাণীই আজ পৃথিবীতে শান্তি আনতে পারে। তাদের বাসনা, হুযুরের এই বাণী বাস্তবায়িত হোক আর তার সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করুক।

কতিপয় অতিথির অভিমত উপস্থাপন করা হল।

কমল জিত সিংহ বখশী, সাংসদ, নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: হযরত মির্যা মসরূর আহমদ আমাদের মাঝে নিউজিল্যাণ্ড এসেছেন আর তাঁর কাছ থেকে আমরা প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনতে পেলাম। এটি আমাদের জন্য বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। গত দশ বছর থেকে জামাতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে। আমার পর্যবেক্ষণ,এই জামাতের প্রধান উদ্দেশ্য হল শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সমন্বয়ের বিকাশ করা।

ইজরায়েলের দূত ইউসুফ লিভনি সাহেব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন: আমার মতে খলীফাতুল মসীহ যে বার্তা দিয়েছেন তা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই বার্তা অবশ্যই এমন যাকে স্বাগত জানানো জরুরী আর এটি প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত। যদি শান্তির কথা বলা হয় তবে শান্তির বিরোধিতা কে করতে পারে? আমার মতে তিনি যে বার্তা দিয়েছেন আর যে দৃষ্টিভঙ্গি তিনি উপস্থাপন করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর যেভাবে তিনি সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করেছেন তার মধ্যেও আমাদের সকলের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে, যারা কমবেশি সকলেই সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ করেছি বা এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আমার বাসনা তাঁর এই বার্তা বাস্তবায়িত হোক আর তা যত দ্রুত হয় ততই মঙ্গল।

সাংসদ সদস্য রাজেন প্রসাদ বলেন: হযরত মির্যা মসরূর আহমদকে নিউজিল্যাণ্ডের সংসদে স্বাগত জানাতে আমি গর্ব অনুভব করছি। আহমদীরা যেভাবে এদেশের নাগরিক হিসেবে বসবাস করে আর শান্তিপূর্ণ বাণীর উপর আমল করে তা আমাকে প্রভাবিত করে।

যুক্তরাজ্যের সহ-হাই কমিশনার, যুক্তরাজ্য প্যাট্রিক রেইলি বলেন: এটা অনেক শক্তিশালী ছিল। আমি এখানে আসার পর পুরোপুরি জানতাম না যে এখানে কি হতে চলেছে। যদি হযরত মির্যা মসরূর আহমদের সম্পর্কে ও তাঁর বাণীর সম্পর্কে কিছুটা জানা ছিল। তবু এটা অনেক প্রভাবশালী অভিজ্ঞতা ছিল। যেভাবে এখানে প্রত্যেক শ্রেণীর উপস্থিত ছিলেন। আমরা যে বার্তা পেয়েছি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন প্রয়োজন হল এটি সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত হোক।

বেদনা অনুভূত হবে। এই বেদনা সৃষ্টি করলে দোয়ার প্রতি আপনাদের মনোযোগ সৃষ্টি হবে। কেবল ব্যক্তিগত বেদনার জন্য দোয়া করবেন না, বরং সমষ্টিগতভাবেও বেদনা সৃষ্টি করেও দোয়া করলে আল্লাহ্ তা'লা ব্যক্তিগত সমস্যারও সমাধান করে দেন। আর বার বার ইইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়া কানাসতাঈন' উচ্চারণ করবেন।

অন্য এক ছাত্র প্রশ্ন করে যে, অনেকে আছেন যারা নিয়মিত নামায পড়েন, অথচ তারা অনৈতিকতা প্রদর্শন করে। এমনটি কেন হয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ইবাদতের পাশাপাশি আপনাকে অবশ্যই মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে হবে আর নিজের আচরণ উন্নত করতে হবে। একটি কাজ তখনই পুণ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যখন আপনার ইবাদতের পাশাপাশি আপনার নৈতিকতা, চরিত্র ও আচরণ উন্নত হয়। কাউকে প্রকৃত ইবাদতকারী তখনই বলা যেতে পারে যখন সে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে আর তাঁকে ভয় করবে। তাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে যখন তাঁর ইবাদত করে, তখন আল্লাহ্‌র বিধিনিষেধ অমান্য করা সম্ভবই নয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, আমরা যখন ইবাদত করি তখন আমাদের আচার আচরণ ও নৈতিকতার মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটা উচিত।

একজন ছাত্র প্রশ্ন করে যে, জামেয়ার আহমদীয়াতে আমার এটি শেষ বছর, এখান থেকে বের হয়ে কিভাবে জামাতে তরবীয়তের কাজ আরম্ভ করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথমত, দোয়ার মাধ্যমে কাজ আরম্ভ করতে হবে। বেশ। আপনি যে কোনও ময়দানে পদার্পণ করেন, আপনার যেখানে নিয়োগ হয়, সর্বপ্রথম সদকা দিন আর দোয়া করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনাকে যে কর্মক্ষেত্রে পাঠিয়েছেন, জীবন উৎসর্গীকরণের আর মুরুব্বী ও মুবাল্লিগ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করার আপনি যে অঙ্গীকার করেছেন সেখানে সঠিক অর্থে সেই অঙ্গীকার যেন রক্ষা করতে পারেন। কুরআন করীমের আদেশ, আপনি যে অঙ্গীকার করেছেন তা রক্ষা করতে হবে। আমানত রক্ষা করা কুরআন করীমের আদেশ। এটি আপনাদের কাছে আমানত স্বরূপ। বুঝতে পেরেছেন? আমানত হল, আপনাকে আহমদীয়াত ও ইসলামের প্রকৃত বাণী অপরের কাছে পৌঁছে দিতে হবে আর এর জন্য সঠিক পথ সন্ধান করতে হবে আর, নিত্যনতুন উপায় বের করতে হবে। এমন যেন না হয় যে মরকয থেকে নির্দেশ আসবে যে বই-পুস্তক বিলি করতে হবে, তখন তা বিলি করলেন। নির্দেশ এল যে, এতজন দায়ি ইলাল্লাহ তৈরী করুন, তখন তা তৈরী করলেন। নির্দেশ এল যে, অমুক স্থানে গিয়ে তবলীগ করুন তাই তবলীগ করলেন। না, এমনটি করবেন না। আপনাদের নিজেকে পথ বের করতে হবে।

আপনাদেরকে দেখতে হবে যে, আপনাদের স্থানীয় পরিস্থিতি অনুসারে কি কি করা প্রয়োজন। কিভাবে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে জামাতের সদস্যদের তরবীয়ত করতে পারেন, কিভাবে আমার বয়স্কদের তবরীয়ত করতে পারি, কিভাবে আমরা যুবকদের, মহিলাদের এবং ছোটদের তরবীয়ত করতে পারি?

একজন মুরুব্বী হিসেবে বিবাদের নিষ্পত্তি করার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন: কোথাও কোনও জামাতে যদি দেখেন দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ রয়েছে তবে সেই বিবাদ দূর করার চেষ্টা করুন। মুরুব্বীদের কাজ হল কোনও পক্ষপাত মুক্ত থাকা। সুবিচারের দাবি হল উভয় পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা। যদি কোনও পক্ষের কাছে মীমাংসা করাতে যান, যতক্ষন তদের মধ্যে মীমাংসা না হয়, তারা পরস্পর এক হয়ে যায়, সকল বিবাদ বিসম্বাদ ও মলিনতা দূর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও এক পক্ষের বাড়িতে চাও খাবেন না আর পানিও খাবেন না। বাড়ি থেকে চা-পানি খেয়ে যাবেন। আর বলে দিবেন, আপনি মীমাংসা করাতে এসেছেন, তাদেরকে বোঝাতে এসেছেন, তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা তৈরী করতে এসেছেন যা কুরআন করীমের আদেশ। তাই আপনি তাদের বাড়িতে ততক্ষণ খাওয়া দাওয়া করবেন না, যতক্ষণ আল্লাহ্ ও রসুলের এই নির্দেশ মান্য না করেন।

দ্বিতীয় প্রতিটি বাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করুন। যে জামাতে আপনার নিয়োগ হয় সেই জামাতের প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে যেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী হয়। তাদের বাড়িতে আসা যাওয়া, ওঠা-বসা এবং তাদের যুবক, বয়স্ক ও বুযুর্গদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক থাকা উচিত। তারা যেন বুঝতে পারে যে, মুরুব্বী সাহেব তাদের সমব্যথী।আর এমন বিশ্বাস তৈরী হওয়া উচিত যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে নিঃসংকোচে গোপন কথা বলে ফেলে। আর আপনি সেই কথা নিজের মনেই রেখে দেন। এমন যেন না হয় যে, একজনের কাছ থেকে তার মনের কথা নিয়ে অন্য জনের কাছে বলে দিলেন। এটিও বিশ্বাস ভঙ্গ করা। এরকম আরও অনেক বিষয় আছে। যখন ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী হয়ে যাবে তখন আপনি দেখবেন যে, আপনার কথার প্রভাবও পড়বে, জামাতের প্রত্যেকে আপনার কথা শুনবে আর জামাত পরস্পর স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা সেই জামাত যাকে সর্বাবস্থায় পৃথিবীতে পুণ্যের প্রসার ঘটাতে হবে।আমরা সেই জামাত যাদেরকে সর্বাবস্থায় পাপ ও অসাধুতা বর্জন করতে হবে। এই মহান কাজ ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ঈমানের বিষয়ে পরিণত হই আর আমরা সকলে নিজেদের যাবতীয় শক্তি ও সামর্থকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী শিরোধার্য করি। আমরা অন্যদেরকে পুণ্য ও সৎপথের দিকে আহ্বান করতে পারব, যখন আমরা নিজেরাও পুণ্যবান হব। (ক্রমশ...)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম জীবিকা দ্বিতীয়টি নেই। (সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ু)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagwangola, (Murshidabad)

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জাপান সফর

জাপান চারটি বৃহৎ দ্বীপ এবং অন্যান্য হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি।জাপানের মোট দৈর্ঘ ২৩৬০ মাইল আর আয়তন তিন লক্ষ্য ৭৭ হাজার বর্গ কিমি। জাপানকে পাহাড়ের দেশও বলা হয়। জাপানের ভূ-ভাগের প্রায় ৬৭ শতাংশ পার্বত্য এবং ৩৩ শতাংশ সমতল ভূমি। যেহেতু অসংখ্য পর্বত শ্রেণীর কারণে বসবাসযোগ্য ভূমি অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছে তাই সমতলভূমিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের বাস যা একে পৃথিবীর সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশে পরিণত করেছে। কেবল রাজধানী টোকিও-র জনসখ্যাই দেড় কোটিতে পোঁছেছে। টোকিও এবং অন্যান্য বড় শহরগুলিতে এমন বিপুল জনসংখ্যাকে অত্যন্ত সুব্যবস্থিতভাবে বসবাসের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। স্থানাভাবে টোকিওতে পাতাল রেলের ব্যবস্থা রয়েছে। কিছু কিছু স্থানে তিন তল বিশিষ্ট রেল লাইন রয়েছে। অনুরূপভাবে মাটির উপর তিন তল পর্যন্ত সড়ক ব্যবস্থা রয়েছে। পুরো শহরে বিভিন্ন স্থানে মাইলের পর মাইল সুদীর্ঘ দুই ও তিন তল বিশিষ্ট উড়াল পুল তৈরী করা হয়েছে যাতে ট্রাফিক নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে।

জাপান একটি ভূমিকম্প প্রবণ দেশ। যার কারণে জাপানকে আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্পের দেশও বলা হয়ে থাকে।

জাপানে আহমদীয়া মিশন স্থাপনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১৯৩৫ সাালে জাপানে আহমদীয়া মিশনের স্থাপনা হয় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)এর যুগে যখন মুকাররম সুফি আব্দল কাদির সাহেব প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে জাপান পোঁছন। প্রায় দুই বছর পর ১৯৩৭ সালের ১০ই জানুয়ারী মাননীয় মৌলবী আব্দুল গফুর নাসের সাহেব দ্বিতীয় মুবাল্লিগ হিসেবে জাপান আসেন। আর সেখানে আহমদীয়াতের বাণী পোঁছনোর কাজ অব্যাহত থাকে। তিনি ১৯৪১ সালে কাদিয়ান ফিরে আসেন। অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৬৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মাননীয় মেজর আব্দুল হামীদ সাহেব মুবাল্লিগ হিসেবে জাপান পোঁছন। এরপর বিভিন্ন সময়ে জাপানে আরও অনেক মুবাল্লিগ এসেছেন। বর্তমানে জাপানের টোকিও এবং নাগোয়া শহরে জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আর উভয় স্থানে জামাতের সেন্টার রয়েছে। কতিপয় জাপানী পুরুষ ও মহিলাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিক পেয়েছেন, যারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিদিন নিজেদের ঈমানে দৃঢ় হচ্ছেন।

মুবাল্লিগদের প্রতি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর উপদেশাবলী।

জাপানের দ্বিতীয় মুবাল্লিগ হিসেবে মৌলবী আব্দুল গফুর নাসির সাহেব যখন রওনা হতে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ১০ই জানুয়ারী ১৩৯৭ উপদেশ দান করেন।

১-সর্বপ্রথম বিষয় যেটি আপনাদের মনে রাখতে হবে তা হল আপনারা তাহরীকে জাদীদের অধীনে যাচ্ছেন যার মুবাল্লিগরা স্বীকার করেছেন যে, সকল অভাব অনটন সহন করে ইসলামের সেবা করবে, তারা বেতনভোগী কর্মী হবে না, বরং চেষ্টা করবে অচিরেই যেন তারা নিজেরাই উপার্জন করে ইসলাম সেবার যোগ্য হয়ে ওঠে। এখন যারা সেখানে আছেন তারা তাহরীকে জাদীদের মুবাল্লিগ নন, তাদেরকে অস্থায়ীভাবে দাওয়াত ও তবলীগের জন্য নেওয়া হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে আপনাদের বিষয়টি তাদের থেকে ভিন্ন। আপনাদের জন্য কোনও রকম জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে। যেমনটি স্পেন, চীন, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের মুবাল্লিগদের জন্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু আপনাদের চেষ্টা করতে হবে, আর আমরাও চেষ্টা করব যাতে আপনারা সেখান থেকে নিজেদের খরচ নিজেরাই উপার্জন করতে পারেন। এর জন্য সহজ পদ্ধতি হল জাপান এবং ভারতে তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে কোনও বাণিজ্যিক ধারা প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু এর পূর্বে আপনাদেরকে জাপানের ভাষা রপ্ত করার চেষ্টা করতে হবে। আপনাদের সামনে হাঙ্গেরী ও স্পেনের মুবাল্লিগদের অসাধারণ কর্মতৎপরতার নমুনা থাকা উচিত, যারা আপনাদের থেকে বেশি প্রতিকূলতার মধ্যে এবং সেই সব দেশে তুলনামূলক অনেক কম খরচে সেখানে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের করেছে আর সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মাঝে আহমদীয়াত ছড়িয়ে দিয়েছে।

২-আপনাদেরকে খোদা তা'লার উপর ভরসা রাখা উচিত, যাঁর পক্ষ থেকে সকল সাহায্য অবতীর্ণ হয়। আর নিয়মিত কুরআন করীম অধ্যয়ন এবং তার বিষয়বস্তু অনুধাবন করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। অনুরূপভাবে জামাতের বই-পুস্তক, পত্র পত্রিকা পড়তে থাকা উচিত।

৩) প্রবাস গমণকারীদের মধ্যে নিজের কাজ দেখানোর জন্য অনেক সময় কৃত্রিমতার প্রতি ঝোঁক বাড়ে। এর থেকে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

৪-সৎকর্ম সৎবচন থেকে থেকে উত্তম। আর ব্যবহারিক তবলীগ মৌখিক তবলীগ থেকে উত্তম। আর উভয় ক্ষেত্রে সৎ সংকল্প মানুষের জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

৫- নামাযের বিষয়ে নিয়মানুবর্তিতা, যথাসম্ভব বা-জামাত নামায এবং যখন সম্ভব হয় তাহাজ্জুদের নামায মানুষের ঈমান এবং আমলকে শক্তিশালী করে।

৬- 'আল্লাহ্ নুরুস সামাওয়াতে ওয়াল আরয'। অতএব ঐশী প্রেমকে সকল সফলতার চাবিকাঠি বলে মনে করা উচিত। যে ব্যক্তি খোদা তা'লাকে উন্মাদের ন্যায় ভালবাসে সে কখনও ধ্বংস হতে পারে না। কিন্তু কাল্পনিক ভালবাসা কোনও উপকারে আসে না। অন্তরকে বিমোহিত করে, সেটিই হল ভালবাসা।

৭- ইসলামের জন্য উন্নতি অবধারিত। আমরা যদি এতে সফল না হই তবে আমাদের দোষ। এখানকার মানুষ এই ধরণের বা সেই ধরণের- এই সব কথা বলা আত্মপ্রবঞ্চনার সামিল।

৮- তবলীগ হোক অনাড়ম্বরপূর্ণ। ইসলাম একটি সহজ সরল ধর্ম, অকারণ দর্শন ও যুক্তির অবতারণা করা উচিত নয়।

৯- যে হাসে সে সত্যের উপর রয়েছে বা সে বুদ্ধিমান, এমনটা জরুরী নয়। অনেক কথায় হাসি পায়, পরে শ্রবণকারীর মনে বিদ্রুপভাব জন্ম নেয়। তাই আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিদের হাসি ঠাট্টায় ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। আর প্রতিটি কথাকে কেবল এ কারণে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়াও উচিত নয় যে আমাদের পিতৃপুরুষেরা এমনটি লিখেন নি। পিতৃপুরুষ নয়, কুরআন করীমই হল সত্য যাচাইয়ের কষ্টিপাথর। তাই প্রত্যেক বিষয়কে কুরআন করীমের মাপকাঠিতে ফেলে যাচাই করুন।

১০- অভাবপীড়িতদের সেবা এবং জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি মনোযোগ দেওয়া মোমেনদের আবশ্যিক করণীয়ের অন্তর্ভুক্ত।

১১- দোয়া একটি অস্ত্র যার সম্পর্কে উদাসীন থাকা উচিত নয়। নিরস্ত্র সৈন্য সফল হতে পারে না।

১২- একজন মুবাল্লিগ জামাতের প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। তাই সাংস্কৃতিক হোক বা রাজনীতিক, ধর্মীয় হোক বা জ্ঞানগত দিক হোক-এদেশের সকল পরিস্থিতি সম্পর্কে জামাতকে ওয়াকিবহাল রাখা উচিত।

১৩- যে দেশে যান, সেই দেশের পরিস্থিতির গহন অধ্যয়ন করুন আর মানুষের আচার আচরণ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে জানুন। তবলীগে সফলতার জন্য এটা জরুরী।

১৪- নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানোও কাজের অংশ। যে ব্যক্তি এতে অলসতা করে, বস্তুত সে কাজই করে না।

১৫-ব্যবস্থাপনার নিয়ম এবং নির্দেশ মেনে চলা আর ভাষণের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। এগুলি ভুলে যাওয়া মানে ইসলামকে ভুলে যাওয়া।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় হোন আর সফর সফল করুন। সফর মঙ্গলময় হোক আর প্রত্যাগমণও মঙ্গালময় হোক আর আল্লাহ্ তা'লাকে তা প্রীত করুক।'

(তারিখে আহমদীয়াত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২১৯-২২০)

৭ই নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে ওয়াকফে নও শিশুদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নোত্তর পর্বের অংশটুকু উপস্থাপন করা হল।

এক শিশু প্রশ্ন করে যে, খোদা তা'লা আঁ হযরত (সা.) কে সব থেকে বড় নবী কেন বানিয়েছেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) খোদা তা'লার সব থেকে প্রিয় নবী। তাঁর উপর শরীয়ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। যেভাবে মানুষ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, মানুষের বৌদ্ধিক চিন্তাধারা এবং কর্মদক্ষতা ক্রমবিবর্তনের ধারা অতিক্রম করে এসেছে আর ক্রমোন্নতির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। অনুরূপভাবে মানুষের সক্ষমতার বিবর্তনের পাশাপাশি ধর্ম এবং শরিয়ত বিধানেরও বিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন জাতি এবং এলাকায় বিভিন্ন যুগে আম্বিয়াগণ এসেছেন আর প্রত্যেক নতুন যুগে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শরিয়তের নতুন বিধিনিষেধ অবতীর্ণ হতে থেকেছে। আর শরীয়ত ধাপে

আপনারা যে চিঠি আমাকে লেখেন,তার এক কোণে নিজের একটি ছবি লাগিয়ে দিবেন, এতে আমি বুঝতে পারব যে, আপনার চিঠি। আর ধীরে ধীরে আমার মনে থেকে যাবে। বিভিন্ন জামেয়ার বুদ্ধিমান ছাত্ররা এমনটাই করে থাকে। এরপর ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে পরিচয়ও হয়। কেবল সম্পর্ক তৈরী করা আর চিনে নেওয়া কোন বড় কথা নয়। যুগ খলীফার পরিকল্পনা, নির্দেশাবলী মেনে চলা হল আসল বিষয়। যখন আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হয়েছি, তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছি, তখন আল্লাহ্ এমন পথ বের করে দিয়েছেন যা সেই সমস্যা থেকে বের করে দিয়েছে। আমার এমনই অভিজ্ঞতা হয়েছে। আর যখনই কোনও সমস্যায় পড়তাম আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য নিয়ে পড়াশোনা সংক্রান্ত সমস্যায় দূর হয়ে যেত

তবলীগের প্রতি যাদের আগ্রহ আছে তারা নিজেরাই নিত্যনতুন পথ সন্ধান করে। আমার মনে আছে, আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, তখন খুদ্দামুল আহমদীর নির্দেশ এল–তোমরা তবলীগের জন্য বাইরে যাও।

জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের ছাত্রদের সঙ্গে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত

২০২১ সালের ১৭ই এপ্রিল জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের ছাত্রদের সঙ্গে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) অনলাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার ইসলামবাদের টিলফোর্ড থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন অপরদিকে জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্ররা কাদিয়ানের কুরআন করীম প্রদর্শনী সভাগৃহ থেকে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের প্রশ্নোত্ত পর্বটি উপস্থাপন করা হল।

এক ছাত্র প্রশ্ন করে যে, আমরা কিভাবে কার্যকরী উপায়ে হিন্দুদের তবলীগ করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তবলীগের ক্ষেত্রে ভারতে অনেক কাজ হচ্ছে।আর এর ফলও প্রকাশ পাচ্ছে। তবুও চেষ্টায় আরও জোর দিতে হবে। একজন মুবাল্লিগের দায়িত্ব হল স্থানীয় জামাতের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং সেই অনুসারে তবলীগের কাজকে বিস্তার দেওয়া, মানুষকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করা। অন্যান্য ধর্মের মানুষদের সঙ্গে আপনার সুসম্পর্ক থাকা চাই, যাদের মধ্যে হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মের মানুষ রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: শাহিদ পাশ করার পর আপনারা যখন মুরুব্বি হিসেবে কর্মক্ষেত্রে যাবেন, তখন মানুষের সঙ্গে আপনাদের নিরন্তর যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবেন আর তাদেরকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে বলুন। ..... তাই আপনারা কতটা পরিশ্রম করতে চান তা আপনাদের উপরই নির্ভর করবে। আমার কাজ হল আপনাদেরকে দিক–নির্দেশনা দেওয়া আর ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা। আর আমি আমার দায়িত্ব প্রায় পালন করেছি। এখন সেগুলিকে বাস্তবায়িত করা আপনাদের কাজ।

হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর ২০০৫ সালের কাদিয়ান সফরের উপকারিতা এবং ফলাফলের উল্লেখ করে এক ছাত্র হুযুর আনোয়ারকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কাদিয়ান কবে আসবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার ইচ্ছে ছিল যাওয়ার, হয়তো গত বছর বা তার আগের বছরও চলে যেতাম। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে সুযোগ হল না। ২০০৮ সালে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, দক্ষিণ ভারতের সফর শেষ করেই ফিরে এসেছিলাম। আমাকে এই পরামর্শই দেওয়া হয়েছিল যে পরিস্থিতির কারণে এখন কাদিয়ানে যাওয়া উচিত হবে না। দেখুন, কবে অনুমতি পাওয়া যায় আর কবে সফর হয়। আল্লাহ্ তা'লা যেমন সুযোগ তৈরী করবেন, ইনশাআল্লাহ্ যাব সেখানে।

এক ছাত্র প্রশ্ন করে যে, তারা কিভাবে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করবে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) সহৃদয় হয়ে উত্তর দেন: আপনারা যে চিঠি আমাকে লেখেন,তার এক কোণে নিজের একটি ছবি লাগিয়ে দিবেন, এতে আমি বুঝতে পারব যে, আপনার চিঠি। আর ধীরে ধীরে আমার মনে থেকে যাবে। বিভিন্ন জামেয়ার বুদ্ধিমান ছাত্ররা এমনটাই করে থাকে। এরপর ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে পরিচয়ও হয়। কেবল সম্পর্ক তৈরী করা আর চিনে নেওয়া কোন বড় কথা নয়। যুগ খলীফার পরিকল্পনা, নির্দেশাবলী মেনে চলা হল আসল বিষয়। মুরুব্বী হওয়ার পর চিন্তাধারা আরও পরিণত হওয়া উচিত। কেননা তাকে যুগ খলীফার প্রকৃত সাহায্যকারী হতে হবে। আপনারা যদি প্রকৃত সাহায্যকারী হন আর কাজ করেন, তাকওয়ার পথে চলেন. মেই মঙ্গে দোয়াও করেন,তবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই কোনও কোনও সুযোগ দিবেন আর বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটে আর আরও বেশি করে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ তৈরী হয়।

প্রশ্ন করে যে, কিভাবে গ্রাম্য এলাকায় বসবাসকারীদেরকে তবলীগকরা যায়, যেখানে মানুষ মাঠে কাজ করে, কায়িক পরিশ্রম করে। আর তাদের কাছে বেশি সময় থাকে না।

গ্রাম্য এলাকায় তবলীগের জন্য দিক–নির্দেশনার দেওয়ার পর হুযুর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, যখন তিনি নিজেও ছাত্র ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তবলীগের প্রতি যাদের আগ্রহ আছে তারা নিজেরাই নিত্যনতুন পথ সন্ধান করে। আমার মনে আছে, আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, তখন খুদ্দামুল আহমদীর নির্দেশ এল–তোমরা তবলীগের জন্য বাইরে যাও। আমরা ছেলেরা সাইকেলে করে গ্রামীণ এলাকায় যেতাম আর সেখানে চাষীদের কাছে গিয়ে বসতাম। যেমন কোনও চাষী ক্ষেতে সেঁচ দিচ্ছে (কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার কারণে এর প্রতি আগ্রহ ছিল)। আমরা তখন সেই চাষীকে বলতাম, 'আমরা সেঁচ দিচ্ছি'। আর এভাবে তাকে সাহায্য করতাম। আর সৌজন্যবশতও সেও আমাদের সঙ্গে কিছু কথা বললে তাকে আহমদীয়াতের পরিচয় করিয়ে দিতাম।

হুযুর আনোয়ার বলেন: 'তাই আগ্রহ থাকলে পথ বেরিয়ে আসে আর সুযোগ তৈরী হয়। ক্ষেত খামারে গিয়েও হলেও।.... আপনার আগ্রহ কতটা আর কতটা দক্ষতা রয়েছে তার উপরই এটা নির্ভর করছে। আগ্রহ না থাকলে মানুষ ভাবে কি কাজ করব? আর যদি আগ্রহ থাকে তবে সামান্য সামান্য সুযোগকেও সে কাজে লাগায়।

হুযুর আনোয়ারের কাছে প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি কি কখনও এমন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যার কারণে আপনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন আর তা থেকে কিভাবে নিস্তার পেয়েছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এমন কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। ছাত্রজীবনে একজন ছাত্রের একটাই লক্ষ্য থাকে, পাস হওয়া। ..... এমনটাই হয়েছে। যখন আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হয়েছি, তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছি, তখন আল্লাহ্ এমন পথ বের করে দিয়েছেন যা সেই সমস্যা থেকে বের করে দিয়েছে। আমার এমনই অভিজ্ঞতা হয়েছে। আর যখনই কোনও সমস্যায় পড়তাম আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য নিয়ে পড়াশোনা সংক্রান্ত সমস্যায় দূর হয়ে যেত।..... আপনাদেরও যদি এমন কোনও সমস্যা আসে, তবে আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা করুন। যখন একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সামনে মানুষ নতজানু হয়,তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে গ্রহণ করেন। দোয়া এবং সদকা–খয়রাত সমস্যাবলী দূর করে দেয়।

প্রশ্ন করা হয় যে, নামাযে আনন্দ কিভাবে পাওয়া যায় আর কিভাবে দোয়ার মাঝে বেদনা সৃষ্টি করা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)একটি সাধারণ পদ্ধতির কথা বলেছেন। যদি তোমাদের অবস্থা এমন না হয় তবে কাঁদুনে চেহারা তৈরী কর। মানুষের বাহ্যিক অবস্থার প্রভাব পড়ে তার অন্তরের উপরও। কখনও কোনও কষ্ট পেলে সেই কষ্টকে সামনে রেখে দোয়া কর, এর ফলে বিগলন ও বেদনা সৃষ্টি হয়। একজন মুরুব্বী, একজন মুবাল্লিগ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে, তাদের সামনে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল পৃথিবীকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করা। এই চ্যালেঞ্জটির কথা মাথায় রেখে মানুষ যখন খোদা তা'লার প্রতি নতজানু হয়, প্রার্থনা করে আর বলে 'আমি এই কাজটি পূর্ণ করার জন্য,আর যুগ খলীফার সুলতানে নাসীর হওয়ার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছি। আর আমি সংকল্প করেছি যে, কিভাবে এই অঙ্গীকার রক্ষা করব। তাই অন্তরের মধ্যেই এক প্রকার

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 5 May, 2022 Issue No. 18

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ধাপে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে থেকেছে। অবশেষে মানুষ যখন বিবর্তনের শিখরে পৌঁছল, তখন আল্লাহ তা'লা আঁ হযরত (সা.)কে আবির্ভূত করলেন। তাঁর মাধ্যমে ধর্ম এবং শরিয়াত উভয়ই পূর্ণতা প্রাপ্ত হল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আম্বিয়াগণ অবগত ছিলেন যে, এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ পূর্ণ বিকশিত হবে আর সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা এমন এক মহান নবীকে আবির্ভূত করবেন যার মাধ্যমে ধর্ম ও শরিয়তকেও পূর্ণ করে দেওয়া হবে। এই জন্যই তো হযরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করেছিলেন যে, হে খোদা! যিনি এমন মহামর্যাদা সম্পন্ন নবীর আগমণ ঘটবে, তিনি যেন আমার উম্মতের মধ্য থেকে আসেন। সুতরাং আঁ হযরত সব থেকে মহান মর্যাদাসম্পন্ন নবী যে, এই কারণে যে, তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'লা ধর্মকে পূর্ণতা দান করেছেন আর শরিয়তকেও। আর শরিয়তের সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআন করীম তাঁর উপর নাযেল হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের চেনা জগতের মাঝে আঁ হযরত (সা.)-এরই সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আর কুরআন করীমের শরীয়তই পরিপূর্ণ শরীয়ত আর ভবিষ্যতের জন্যও এটি পরিপূর্ণ শরিয়ত হিসেবে টিকে থাকবে। ভবিষ্যতে কোনও যুগে কোনও এলাকায় যদি নতুন জগত আবিষ্কৃত হয়, তবে সেখানে বসবাসরত জাতিসমূহের জন্যও আঁ হযরত (সা.)-এর শরিয়তই শরীয়ত হবে। আর তাঁর বাণীই তাদের কাছে পৌঁছবে। কেনন, আঁ হযরত (সা.)কে জগতসমূহের জন্য আশীর্বাদ বলা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত উপজাতির উদাহরণ দিয়ে বলেন, এই জাতিটি পঞ্চাশ ষাট হাজার বছর প্রাচীন। কিন্তু যখন এই জাতিটির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা গেল, তখন তাদেরকে কাছে আঁ হযরত (সা.)এর বাণী পৌঁছে গিয়েছিল। আর সেই জাতি কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

একজন শিশু প্রশ্ন করে যে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশ থেকে মুক্তি পেয়ে কাশ্মীরের দিকে যাত্রা করেছিলেন। আর সেখানেই তিনি সমাহিত আছেন। খৃষ্টানরাও এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছে। তবে তারা কেন একথা স্বীকার করে না যে, হযরত ঈস (আ.) কাশ্মীরে সমাধিস্ত আছেন।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এ বিষয়ে খৃষ্টানদের গবেষণা ব্যপকহারে হয়েছে। একথা সত্য। কিন্তু তাদের চোখ অন্ধ।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালের একজন খৃষ্টানের সঙ্গে বিতর্ক হচ্ছিল। তিনি (রা.) প্রমাণ করেন যে তোমাদের ত্রিত্ববাদের মতবাদ ভ্রান্ত।এতে সেই খৃষ্টান উত্তর দেওয়ার জন্য কোনও যুক্তি দিতে না পেরে বলল, এশিয়ানদের মাথায় এসব ঢুকবে না।

এতে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল বললেন, তুমি সমস্যার সমাধান করে দিয়েছ। তোমাদের নিজেদের গ্রন্থ অনুযায়ী ঈসা এশিয়ান বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনিই যখন এই বিষয়টি বোঝেন নি, সেখানে তোমরা কি করে বুঝবে?

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন অনেক বিজ্ঞানী দাবি করেন যে, অন্যান্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা প্রমাণ হয় নি। তবে সর্বত্রই খোদার সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকতে পারে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মূসা (আ.) যখন একথা ব্যক্ত করলেন যে তিনি খোদাকে দেখতে চান,তখন আল্লাহ্ তা'লা বললেন- তুমি মোটেই দেখতে পারবে না। কিন্তু তুমি ঐ পাহাড়ের দিকে দেখ। সুতরাং এটি যদি স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা পর্বতের উপর নিজের জ্যোতির্বিকাশ ঘটালেন আর সেটিকে টুকরো টুকরো করে দিলেন। তখন হযরত মূসা সম্বিত হারিয়ে ভূপতিত হলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা তো নুর। তাঁকে কিভাবে দেখা যেতে পারে? হযরত মূসার আল্লাহ্ তা'লার উপর ঈমান ছিল। কিন্তু খোদা তা'লাকে দেখার ইচ্ছে ব্যক্তি করেছিলেন। আর তিনি খোদা তা'লার জ্যোতির্বিকাশ দেখতে সক্ষম হলেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খোদা তা'লাকে আমরা প্রতিটি জিনিসের মধ্যে দেখতে পাই। আপনাদের এখানে ফুজি পর্বত রয়েছে। গাছপালা, বনাঞ্চল এবং অন্যান্য পর্বত রয়েছে, ঘন সবুজের সমাহার রয়েছে। আর এখানে ভূমিকম্পও আসে। এই সব কিছুতে খোদার জ্যোতির্বিকাশ ও তাঁর শক্তিমত্তা দেখতে পাওয়া যায়।

একজন শিশু প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার কখনও ভেবেছিলেন যে বড় হয়ে কি হবেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যা ভেবেছিলাম তা হইনি। আমি ভাবতাম ডাক্তার হব। আবার সেনাতে যাওয়ারও বাসনা ছিল যা পূর্ণ হয় নি।

ওয়াকফাতে নওদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের ক্লাস।

প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর এক পর্যায়ে আয়েশা মোনা 'জাপানী জাতি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর খলীফাদের মনোযোগ এবং উদ্ধৃতিসমূহ।' উপস্থাপন করেন।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)কে স্বপ্নে আল্লাহ্ তা'লা কিছু পাখি দেখান আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলা হয়, 'জাপানি জাতি এই মুহূর্তে একেবারে মৃত অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সেই জাতির হৃদয়কে আহমদীয়াতের প্রকি আকৃষ্ট করবেন। এরপর তারা ক্রমশ শক্তি অর্জন করবে। আর আমার আহ্বানে এমনভাবে সাড়া দিবে যেভাবে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর ডাকে পাখিরা সাড়া দিয়েছিল। "

(দৈনিক আল ফযল, ১৯ অক্টোবর, ১৯৪৫, পৃ: ১-২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর শেষে এবং পঞ্চাদশ শতাব্দী হিজরীর প্রারম্ভে জাপান সফরের মঞ্জুরী দেন। কিন্তু ডাক্তাদের নির্দেশের ভিত্তিতে তিনি সফর করতে পারেননি। অবশেষে ১৯৮৯ সালের ২৪ শে জুলাই সেই ঐতিহাসিক দিনটি উপস্থিত হল যেদিন সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চতুর্থ খলীফা পদার্পণ করলেন। ১৯৮৯ সালের ২৮ শে জুলাই এর খুতবায় তিনি জাপানি জাতিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন-আজ পর্যন্ত আমি কোনও জাতির আচার আচরণ ও নৈতিকতায় এতটা প্রভাবিত হইনি যতটা প্রভাবিত হয়েছি জাপানি জাতির আচার আচরণ ও নৈতিকতা দেখে। এদের মধ্যে সততা এবং বিনয় রয়েছে। এগুলি এমন বৈশিষ্ট্য যা খোদা তা'লা ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে দেখেন। এদের আচরণে স্বচ্ছতা রয়েছে আর এরা প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী। কিন্তু কিছু দেশ তাদের সঙ্গে অসৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে যার কারণে ইসলামের অত্যন্ত ভয়ানক চিত্র এখানকার জনমানসে তৈরী হয়েছে। তাই জামাত আহমদীয়ার কর্তব্য হল এই সদাচার এবং উন্নত নৈতিকতার ক্ষেত্রে এদের থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। কেননা, আপনাদের নেপথ্যে রয়েছে এক মহান ধর্মীয় শিক্ষার অনুপ্রেরণা।" (ক্রমশ.....)

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir